গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত
Intended Nationally Determined Contribution (INDC)-এর
বাংলা ভাষান্তর

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায়

বাংলাদেশের জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অনুমিত অবদান

ভাষান্তর : হাসান মেহেদী

Coastal Livelihood and Environmental Action Network clean

CCDB Member of actalliance

climate justice actnow for climate justice

csrl

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায়

বাংলাদেশের জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অনুমিত অবদান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় প্রকাশিত
Intended Nationally Determined Contribution (INDC)-এর
বাংলা ভাষান্তর

ভাষান্তর
হাসান মেহেদী

সম্পাদনা
মুহাম্মদ আতিকুল হক
ড. খালিদ হোসেন
গৌরাঙ্গ নন্দী
জিয়াউল হক মুক্তা
সাজ্জাদুর রহিম পান্থ

clean
CCDB Member of actalliance
csrl
act now for climate justice
Brot für die Welt

এই ভাষান্তরিত সংস্করণটি
শুধুমাত্র ধারণাগত উন্নয়ন ও সচেতনায়নে ব্যবহারের জন্য,
আইনি ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য নয়

এই প্রকাশনা বা এর যে কোনো অংশ অবাণিজ্যিক ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক উদ্দেশ্যে ভাষান্তরকারী বা প্রকাশকের অনুমতি ছাড়াই প্রকাশ, সংরক্ষণ বা বিতরণ করা যাবে। কেবলমাত্র সূত্র উল্লেখের অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

এই পুস্তিকার প্রচ্ছদে ব্যবহৃত বাংলাদেশ সরকারের প্রতীক-এর স্বত্বাধিকারী শুধুমাত্র গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

মূল দলিল প্রকাশ
সেপ্টেম্বর ২০১৫

ভাষান্তর প্রকাশ
অগ্রহায়ণ ১৪২২ | নভেম্বর ২০১৫

প্রচ্ছদের ছবি
নুরুল আলম মাসুদ

সহযোগিতা
ব্রেড ফর দ্য ওয়ার্ল্ড

এই দলিলের বক্তব্যের সঙ্গে ক্লিন, সিসিডিবি, সিএসআরএল বা ব্রেড ফর দ্য ওয়ার্ল্ড-এর মতামতের মিল নাও থাকতে পারে।

মূল দলিলের তথ্যসূত্র
http://moef.portal.gov.bd/sites/default/files/files/moef.portal.gov.bd/news/e5b66c44_371b_49e2_99ef_d40e9b4ac029/file-indc.pdf

যোগাযোগ

উপকূলীয় জীবনযাত্রা ও পরিবেশ কর্মজোট
নূরী মঞ্জিল, ৩৯ ফারুকিয়া মসজিদ ক্রসরোড
বয়রা, খুলনা ৯০০০, বাংলাদেশ
ফোন : +৮৮ ০১৭১৬ ৭০২ ০০৬
ইমেইল : info@cleanbd.org
ওয়েব : http://www.cleanbd.org

ক্রিশ্চিয়ান কমিশন ফর ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ
৮৮ সেনপাড়া পর্বতা, মিরপুর ১০
ঢাকা ১২১৬, বাংলাদেশ
ফোন : +৮৮ ০২ ৮০১ ১৯৭০-৩
ইমেইল : ccdb@bangla.net
ওয়েব : http://www.ccdb-bd.org

সূচি

বাংলা ভাষান্তরের ভূমিকা v
ভাষান্তর প্রসঙ্গে vii
আদ্যক্ষরা ix
টীকাপুঞ্জ xii

এক. জাতীয় প্রেক্ষাপট ১

দুই. প্রশমন ৩
২.১ 'গতানুগতিক কার্যক্রম' থেকে নির্গমন ৩
২.২ প্রশমনে অবদান প্রসঙ্গে ৩
২.৩ প্রশমন কর্মসূচি ৫
২.৩.১ *প্রশমনের উদ্দেশ্য* ৫
২.৩.২ *বিদ্যমান প্রশমন উদ্যোগসমূহ* ৬
২.৩.৩ *বিদ্যুৎ, শিল্প ও পরিবহন খাতে সম্প্রসারিত প্রশমন উদ্যোগ* ৬
২.৩.৪ *অন্যান্য খাতে সম্প্রসারিত প্রশমন উদ্যোগ* ৮
২.৪ *সংজ্ঞায়ন, স্বচ্ছতা ও ধারণা উন্নয়নের জন্য তথ্যায়ন* ৯
২.৫ ন্যায্য ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী লক্ষ্য ১২

তিন. অভিযোজন ১৩
৩.১ বিপন্নতার ভিত্তিতে বাংলাদেশের অবস্থা ১৩
৩.২ অভিযোজনের লক্ষ্য ১৩
৩.৩ অভিযোজন উদ্যোগ : অতীত ও বর্তমান ১৩
৩.৪ ভবিষ্যত আকাঙ্ক্ষা : স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা ও কর্মসূচি ১৪
৩.৫ বাধা ও চাহিদা ১৭

চার. আইএনডিসি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন ১৮

পাঁচ. আইএনডিসি বাস্তবায়নে সহায়তা ২০
৫.১ অভিযোজন ব্যয় ২০
৫.২ প্রশমন ব্যয় ২১

পরিশিষ্ট ১. অভিযোজন প্রকল্প এবং অর্জনসমূহ ২৩
নির্ঘণ্ট : বাংলা পরিভাষাসমূহ ২৪

ছক ও লেখচিত্র

ছক ১ : জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অনুমিত অবদান - প্রশমন ৩

ছক ২ : ২০৩০ সাল নাগাদ বিদ্যুৎ, পরিবহণ ও শিল্প (জ্বালানি) খাতে নির্গমন হ্রাসের ভবিষ্যানুমান ৪

ছক ৩ : বিসিসিএসএপিতে উল্লেখিত প্রশমন কর্মসূচিসমূহ ৫

ছক ৪ : শর্তযুক্ত অবদানের আওতায় সম্ভাবনাময় প্রশমন-উদ্যোগ ৭

ছক ৫ : সম্ভাব্য শর্তযুক্ত কার্যক্রমভিত্তিক অবদানসমূহ ৮

ছক ৬ : সংজ্ঞায়ন, স্বচ্ছতা ও ধারণা উন্নয়নের তথ্যাবলী ১০

ছক ৭ : প্রধান প্রধান অভিযোজন কর্মসূচির প্রাক্কলিত ব্যয় ২১

ছক ৮ : প্রধান প্রধান প্রশমন কর্মসূচির প্রাক্কলিত ব্যয় ২১

লেখচিত্র ১ : ২০১১-২০৩০ সাল মেয়াদে বিদ্যুৎ, পরিবহণ ও শিল্পখাতে গ্রীনহাউজ গ্যাস নির্গমনের অনুমান (মিলিয়ন টন কার্বন ডাই-অক্সাইডের সমতূল্য) ৪

বাংলা ভাষান্তরের ভূমিকা

২০১৩ সালে পোল্যান্ডের ওয়ার'শ-তে অনুষ্ঠিত জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক জাতিসঙ্ঘ কর্মকাঠামো সনদ (ইউএনএফসিসিসি)'র উনিশতম সম্মেলনের (কপ১৯) সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সকল সদস্য রাষ্ট্রকে তাঁদের জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অনুমিত অবদান (Intended Nationally Determined Contributions - INDC) প্রণয়নের জন্য জাতীয় পর্যায়ে উদ্যোগ গ্রহণ অথবা গৃহীত উদ্যোগ ত্বরান্বিত করার আহ্বান জানানো হয়। এই দলিলে ২১০০ সাল নাগাদ বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি ২ ডিগ্রী সেলসিয়াসের মধ্যে রাখার জন্য সদস্য রাষ্ট্রটি জাতীয় দূষণ কী পরিমাণ কমাবে এবং কমানোর জন্য কী ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করবে সে সংক্রান্ত একটি দিক-নির্দেশনা চাওয়া হয়। পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলায় কি ধরনের অভিযোজন কার্যক্রম গ্রহণ করতে যাচ্ছে তারও একটি বর্ণনা আইএনডিসি'তে প্রত্যাশা করা হয়েছে। এসব কার্যক্রম গ্রহণ করতে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের কী ধরনের সহায়তার প্রয়োজন তা যেমন এ দলিলে উল্লেখ করার কথা বলা হয়েছে, তেমনি রাষ্ট্রটি জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলায় কী ধরনের সহায়তা করতে পারে তারও একটি দিক-নির্দেশনা চাওয়া হয়েছে।

প্রতিটি সদস্যরাষ্ট্র কর্তৃক আইএনডিসি প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ২০১৫ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিতব্য ইউএনএফসিসিসি'র একুশতম সম্মেলনে (কপ২১) একটি জলবায়ু চুক্তিতে উপনীত হওয়া যা ২০২০ সাল থেকে কার্যকর হবে। কপ১৯-এর সিদ্ধান্তে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, একটি সদস্য রাষ্ট্রের আইএনডিসিতে উল্লেখিত অবদানসমূহ, কার্যক্রম বা সহায়তার কোনো আইনি বাধ্যবাধকতা নেই। তবুও ধারণা করা হচ্ছে যে, কপ২১-এ আলাপ আলোচনার গুরুত্বপূর্ণ এমনকি মূল ভিত্তি হবে বিভিন্ন সদস্যরাষ্ট্র কর্তৃক প্রণীত এই দলিল। ইতোমধ্যে ২০১৪ সালে পেরুর লিমায় অনুষ্ঠিত ইউএনএফসিসিসি'র কুড়িতম সম্মেলনের (কপ২০) সিদ্ধান্ত বা Lima Call for Climate Action-এ এর ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। কপ২০-এর ঘোষণায় প্যারিস কপ২১-এর কয়েকমাস পূর্বেই সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে আইএনডিসি জমা দেয়ার জন্য আহবান জানানো হয় যাতে পেশকৃত দলিলটি বুঝতে এবং এর স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় আলাপ-আলোচনার যথেষ্ট সুযোগ পাওয়া যায়।

এরই ধারাবাহিকতায় এ বছর সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম রাষ্ট্র হিশেবে বাংলাদেশ নিজস্ব 'জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অনুমিত অবদান' বা আইএনডিসি জমা দেয়। কপ২০-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্বল্পোন্নত রাষ্ট্র হিসেবে নিচুমাত্রায় গ্রীনহাউজ গ্যাস নির্গমনের মাধ্যমে উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে যে বিশেষ পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হবে তা আইএনডিসি'তে উল্লেখ করার সুযোগ পায় বাংলাদেশ। তাছাড়া উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ একটি শক্তিশালী আইএনডিসি প্রণয়ন ও জমা দেয়ার জন্য Climate and Development Knowledge Network (CDKN) এর কাছ থেকে দেড় লক্ষ ব্রিটিশ পাউন্ডের একটি প্রকল্প সহযোগিতা পায় (CDKN Project Reference: TAAS0050)। তবে আইএনডিসি প্রণীত হওয়ার সময় জাতীয় পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য আলাপ-আলোচনা না হওয়ায় এটিকে এখন সবার কাছে পৌছে দিয়ে আরো আলোচনার মাধ্যমে একটি শক্তিশালী নীতিতে পরিণত করার সুযোগ রয়েছে।

এমন পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের জাতীয় অবদানের সংকল্পপত্র বা আইএনডিসি নিয়ে আরো

আলোচনার ক্ষেত্র তৈরি করা দরকার বলে আমরা মনে করি। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ভীষণরকম ঝুঁকিপূর্ণ দেশ হিশেবে আমাদের নিজেদের স্বার্থেই এই আলোচনার প্রয়োজন, যাতে উন্নত বিশ্বের মতো আচরণ করে আমরা নিজ ক্ষতির কারণ না হই, আবার আমাদের উন্নয়নের চাকাও যেন সচল থাকে। এক্ষেত্রে আমরা মনে করি, ইতোমধ্যে প্রণীত আইএনডিসি হতে পারে এক ধরনের রোডম্যাপ আর এই রোডম্যাপটি সম্পর্কে প্রয়োজন ব্যাপক জনসচেতনতা। সেই উদ্দেশ্য সামনে রেখে আমরা বাংলাদেশের জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অনুমিত অবদান (আইএনডিসি)-এর বাংলা ভাষান্তর প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছি। আমরা আশা করছি, এই ভাষান্তরিত আইএনডিসি'টি জনগণের কাছাকাছি হবে, আরো আলোচনার সুযোগ সৃষ্টি করবে এবং বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় দলিলটি যথার্থই একটি শক্তিশালী রোডম্যাপে পরিণত হবে।

দলিলটি বাংলায় ভাষান্তরে সহযোগিতার জন্য উপকূলীয় জীবনযাত্রা ও পরিবেশ কর্মজোট (ক্লিন)-এর প্রধান নির্বাহী হাসান মেহেদীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। একই সঙ্গে সম্পাদনার সঙ্গে জড়িত সকলকে জানাচ্ছি হার্দিক অভিবাদন। এ প্রকাশনাটিতে সহযোগিতা করার জন্য গ্রামীণ জীবনযাত্রার স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের জন্য প্রচারাভিযান (সিএসআরএল), অ্যাক্টনাও প্রচারাভিযান, অ্যাক্ট অ্যালায়েন্স ও ব্রেড ফর দ্য ওয়ার্ল্ড-এর প্রতিও রইলো কৃতজ্ঞতা।

সকলের কল্যাণ ও পরামর্শ কামনায় -

ড. খালিদ হোসেন
প্রকল্প সমন্বয়কারী, জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিট
ক্রিশ্চিয়ান কাউন্সিল ফর ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ (সিসিডিবি)

বাংলা ভাষান্তর প্রসঙ্গে

সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা ও উন্নয়নের উপর প্রভাব ফেলে এমন জাতীয়-আন্তর্জাতিক নীতি-সনদ-আইনসমূহ বাংলাভাষীদের জন্য সহজবোধ্য করার লক্ষ্যে ইতোপূর্বে উপকূলীয় জীবনযাত্রা ও পরিবেশ কর্মজোট (ক্লিন)-এর উদ্যোগে জাতিসঙ্ঘ ধর্মীয়, নৃতাত্ত্বিক ও ভাষাগত সংখ্যালঘু অধিকারের ঘোষণাপত্র, জাতিসঙ্ঘ আদিবাসী অধিকারের ঘোষণপত্র, জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক জাতিসঙ্ঘ কর্মকাঠামো সনদ (ইউএনএফসিসিসি), কোপেনহেগেন সন্ধি এবং বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশলপত্র ও কর্মপরিকল্পনা (বিসিসিএসএপি) ভাষান্তর ও প্রকাশ করা হয়। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় বাংলাদেশের জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অনুমিত অবদান (আইএনডিসি) এই সিরিজের ষষ্ঠ প্রকাশনা।

২০১৪ সালে অনুষ্ঠিত জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক জাতিসঙ্ঘ কর্মকাঠামো সনদের 'লিমা ঘোষণা'র সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এ বছর ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত ইউএনএফসিসিসি'র ১৯৬টি সদস্য দেশের মধ্যে ১২৯টি দেশ নিজস্ব 'জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অনুমিত অবদান' পেশ করেছে। অধিকাংশ দেশই ২১০০ সাল নাগাদ 'তাপমাত্রা বৃদ্ধির হার ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে রাখার প্রতিশ্রুতি' অনুযায়ী প্রশমন কর্মসূচির পাশাপাশি অভিযোজন এবং মিশ্র-কর্মসূচির প্রতিশ্রুতিও পেশ করেছে। অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মতো বাংলাদেশের প্রণীত সংকল্পপত্রে ভবিষ্যত প্রশমন-কৌশলের সাথে সাথে অভিযোজন তথা জলবায়ু-সহিষ্ণুতা বৃদ্ধির উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা, এভাবেই মাতৃভাষার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে। কিন্তু প্রায়ই বাংলাদেশের জাতীয় দলিল, আইন ও চুক্তিসমূহ ইংরেজিতেই প্রণয়ন ও প্রচার করা হয়। এ কারণে প্রায়শই ধোঁয়াশাচ্ছন্ন ভাষাসৃষ্ট উপরি-কাঠামোর সঙ্গে সমাজ-রাজনৈতিক, পরিবেশ ও উন্নয়নকর্মীদের অনর্থক মতানৈক্য তৈরি হয়। রাষ্ট্রভাষায় প্রাথমিক দলিল প্রণয়নের পর ভাষান্তরিত ইংরেজি ভাষ্য প্রকাশ করাই আদর্শ অবস্থান।

তবে, আধুনিক যোগাযোগ ও বাণিজ্যসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে বিশেষত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক পরিভাষা তৈরি, রূপান্তর ও প্রয়োগে বাংলা ভাষা যে ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে, তা স্বীকার করতে এখন আর দ্বিধা নেই। এ কারণে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে উপস্থাপনের জন্য প্রণীত দলিল বাংলায় প্রণয়ন করা কঠিন হয়ে গেছে। সুতরাং, সংবিধানের নির্দেশ অনুসরণ করার জন্য প্রতিটি ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞদের এগিয়ে আসার কোনো বিকল্প নেই। সেটি করা হলেই ভাষান্তরের ত্রুটি কমে এসে একইসঙ্গে সাধারণের বোধগম্য ও মূলানুগ হয়ে উঠতে পারবে। ততোদিন পর্যন্ত ইংরেজি বা অন্য ভাষার শাব্দিক উৎপ্রেক্ষা বাংলায় যথাযথ প্রকাশে বাধা রয়েই যাবে। এই দলিলও সেই ত্রুটি থেকে মুক্ত নয়।

এমনি নানা ক্ষেত্রেই পরিভাষার তুলনায় বোধগম্যতার উপর গুরুত্ব দিয়েই দলিলটি ভাষান্তর করা হয়েছে। দলিলটি ভাষান্তরের সময় বিদেশি ভাষা এড়িয়ে যাবার সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হয়েছে কেননা চর্চার মধ্য দিয়েই বাংলা পরিভাষা প্রচলিত হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। তবে কোনো কোনো শব্দের বাংলা পরিভাষা বোধগম্য হবে না বিধায় ইংরেজিই রেখে দেয়া হলো। বাংলা পরিভাষাগুলো পাঠকদের বোঝার সুবিধার্থে এ পুস্তিকা শেষের নির্ঘণ্টে বাংলা ও ইংরেজি পরিভাষার একটি তালিকা দেয়া হয়েছে। এছাড়া শুরুতেই কৌশলগত ও প্রযুক্তিগত শব্দ বা শব্দবন্ধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া

হয়েছে। এই দলিলে ব্যবহৃত ছক, নকশা ও তথ্যপত্রগুলো মূল দলিলের হুবহু প্রতিলিপি। মূল দলিলে না থাকলেও পাঠকদের সুবিধার্থে ভাষান্তরিত সংস্করণে আদ্যক্ষরা দেয়া হয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তন এখন শুধুমাত্র বিজ্ঞানী বা নীতি নির্ধারকদের বিষয় নয় বরং রাজনৈতিক কর্মী, শিক্ষার্থী, নাগরিক সমাজ, তরুণ সমাজ, সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠক ও উন্নয়নকর্মীদের সক্রিয় দায়িত্ব পালন করা অত্যন্ত জরুরি। আইএনডিসি'র মূল ভাষ্য ইংরেজি ভাষায় রচিত হওয়ায় আগ্রহী সমাজ-রাজনৈতিক ও উন্নয়নকর্মীদের জন্য এই জাতীয় দলিলটি বাংলায় ভাষান্তর করা হলো। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত বা অনুমোদিত না হওয়ায় এই ভাষান্তরিত সংস্করণটি আইনি ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য নয়, এবং শুধুমাত্র সচেতনায়ন, ধারণা বৃদ্ধি বা জ্ঞান ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এটি ব্যবহার করা যাবে।

এই প্রকাশনার সম্পাদনা পর্ষদের সদস্যগণ – প্রখ্যাত সাংবাদিক ও পরিবেশকথক গৌরাঙ্গ নন্দী, গ্রামীণ জীবনযাত্রার স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের জন্য প্রচারাভিযান (সিএসআরএল)-এর সহ-সভাপতি জিয়াউল হক মুক্তা, ক্রিশ্চিয়ান কমিশন ফর ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ (সিসিডিবি)'র জলবায়ু পরিবর্তন বিভাগের সমন্বয়কারী খালিদ হোসেন ও মুহাম্মদ আতিকুল হকের সঙ্গে ক্লিন-এর সভাপতি সাজ্জাদুর রহিম পান্থ ও পার্টিসিপেটরি রিসার্চ অ্যান্ড অ্যাকশন নেটওয়ার্ক (প্রান)-এর প্রধান নির্বাহী নুরুল আলম মাসুদ প্রকাশনাটির ভাষান্তর, বাক্যগঠন ও বানান সংশোধনে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। এজন্য তাঁদের প্রতি অন্তর থেকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

আমাদের প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে বাংলাদেশের জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অনুমিত অবদান (আইএনডিসি) ভাষান্তরে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়ার জন্য সিসিডিবি, সিএসআরএল, অ্যাক্ট-অ্যালায়েন্স, অ্যাক্ট-নাও ক্যাম্পেইন ও ব্রেড ফর দ্য ওয়ার্ল্ড এবং এসব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত সকল কর্মকর্তা-কর্মীর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

শুভ, সহযোগিতা ও সমালোচনা প্রত্যাশায় –

হাসান মেহেদী
প্রধান নির্বাহী, ক্লিন
খুলনা, ১৫ নভেম্বর ২০১৫

আদ্যক্ষরা

ADB	Asian Development Bank এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক
AWD	Alternate Wetting and Drying সেচ-আবর্তন (জমির আর্দ্রকরণ ও শুষ্কায়নের আবর্তন)
BAU	Business As Usual গতানুগতিক কার্যক্রম
BCCSAP	Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশলপত্র ও কর্মপরিকল্পনা
BCCRF	Bangladesh Climate Change Resilience Fund বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণুতা তহবিল
BCCTF	Bangladesh Climate Change Trust Fund বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড
BIWTA	Bangladesh Inland Water Transport Authority বাংলাদেশ আভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ কর্তৃপক্ষ
BWDB	Bangladesh Water Development Board বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বা-পাউবো)
CALIP	Climate Adaptation and Livelihood Protection জলবায়ু অভিযোজন ও জীবিকা সুরক্ষা
CCA	Climate Change Adaptation জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন
CCPP	Combined Cycle Power Plant সমন্বিত আবর্তনের বিদ্যুৎকেন্দ্র
CCVI	Climate Change Vulnerability Index জলবায়ু বিপন্নতা সূচক
CFF	Climate Fiscal Framework জলবায়ু-অর্থব্যবস্থার কাঠামো
COP	Conference of Parties পক্ষসমূহের সম্মেলন (কপ)
CO_2e	Carbon Dioxide Equivalent কার্বন ডাই-অক্সাইড সমতূল্য

DMA	Disaster Management Act দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন
ECRRP	Emergency Cyclone Recovery and Restoration Project ঘূর্ণিঝড়-পরবর্তী জরুরি পুনরুদ্ধার ও পুনর্নির্মাণ প্রকল্প
EECMP	Energy Efficiency and Conservation Master Plan জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ মহাপরিকল্পনা
GCF	Green Climate Fund গ্রীন ক্লাইমেট ফান্ড
GDP	Gross Domestic Product মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদন
GHG	Greenhouse Gas গ্রীনহাউজ গ্যাস
HILIP	Haor Infrastructure and Livelihood Improvement Project হাওর অবকাঠামো ও জীবিকা উন্নয়ন প্রকল্প
ICS	Improved Cooking Stove উন্নততর চুলা
INDC	Intended Nationally Determined Contribution জাতীয় অবদানের সংকল্পপত্র
IPCC	Intergovernmental Panel on Climate Change জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক আন্তসরকারি প্যানেল
km	Kilometre কিলোমিটার (কিমি)
LCCA	Lima Call for Climate Action জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় লিমা ঘোষণা
LDC	Least Developed Country স্বল্পোন্নত দেশ
LEAP	Long-range Energy Alternatives Planning দীর্ঘমেয়াদি বিকল্প জ্বালানি পরিকল্পনা (লীপ)
LGED	Local Government Engineering Department স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
LPG	Liquid Petroleum Gas তরল পেট্রোলিয়াম গ্যাস
LULUCF	Land Use, Land Use Change and Forestry ভূমি ব্যবহার, ভূমি ব্যবহারে পরিবর্তন ও বনায়ন (লুলুসিএফ)

MOEF	Ministry of Environment and Forest পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
MRV	Monitoring, Reporting and Verification নিরীক্ষণ, প্রতিবেদন পেশ ও প্রত্যয়ন ব্যবস্থা
MW	Megawatt মেগাওয়াট
NAMA	Nationally Appropriate Mitigation Action জাতীয় ক্ষেত্রে যথাযথ প্রশমন কর্মসূচি (নামা)
NAP	National Adaptation Plan জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা (ন্যাপ)
NAPA	National Adaptation Plan of Action জাতীয় অভিযোজন কর্মপরিকল্পনা (নাপা)
NEC	National Environment Committee জাতীয় পরিবেশ কমিটি (নেক)
NSDS	National Sustainable Development Strategy জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশলপত্র
REP	Renewable Energy Policy নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতি
SREDA	Sustainable and Renewable Energy Development Authority টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
UNEP	United Nations Environment Programme জাতিসঙ্ঘ পরিবেশ কর্মসূচি
UNFCCC	United Nations Framework Convention on Climate Change জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক জাতিসঙ্ঘ কর্মকাঠামো সনদ
WMO	World Meteorological Organization বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা

টীকাপুঞ্জ

জলবায়ু বিপন্নতা সূচক

জনসংখ্যা, প্রতিবেশব্যবস্থা ও বাণিজ্যের উপর আগামী ৩০ বছরে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বিবেচনায় নিয়ে যুক্তরাজ্যের ভেরিস্ক ম্যাপলক্রফট (Verisk Maplecroft) নামক একটি প্রতিষ্ঠান ২০১১ সালে প্রথম Climate Change Vulnerability Index বা জলবায়ু বিপন্নতা সূচক প্রকাশ করে। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ন্যাচারসার্ভ (NatureServe) নামক একটি প্রতিষ্ঠানও ভিন্নতর আঙ্গিকে জলবায়ু বিপন্নতা সূচক প্রণয়ন করে থাকে। পাশাপাশি জার্মানওয়াচ (GermanWatch) ২০০৮ সাল থেকে জলবায়ুজনিত দুর্যোগ ও আর্থসামাজিক ক্ষয়ক্ষতির উপর ভিত্তি করে প্রতিবছর Climate Risk Index বা জলবায়ু ঝুঁকি সূচক প্রকাশ করে আসছে। এসব সূচকের বিশ্লেষণ অনুযায়ী বিশ্বের সবথেকে জলবায়ু-বিপন্ন দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অবস্থান সবার উপরে।

জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক আন্তসরকারি প্যানেল (আইপিসিসি)

১৯৮৮ সালে জাতিসঙ্ঘ পরিবেশ কর্মসূচি (ইউএনইপি) ও বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা (ডাব্লিউএমও)-এর যৌথ উদ্যোগে জলবায়ু-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ের বিজ্ঞানীদের সমন্বয়ে Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) গঠন করা হয়। পৃথিবী জুড়ে কয়েক হাজার বিজ্ঞানী ও বিশ্লেষক স্বেচ্ছাসেবার ভিত্তিতে আইপিসিসির সঙ্গে যুক্ত। বৈজ্ঞানিক তথ্য দিয়ে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক জাতিসঙ্ঘ কর্মকাঠামো সনদ (ইউএনএফসিসিসি)-কে সহায়তা করাই আইপিসিসি'র দায়িত্ব। এ উদ্দেশ্যে আইপিসিসি মানবসৃষ্ট জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং প্রশমন ও অভিযোজন বিষয়ে মূল্যায়ন প্রতিবেদন তৈরি করে থাকে। মূল্যায়ন প্রতিবেদন তৈরি করার জন্য আইপিসিসি কোনো গবেষণা পরিচালনা করে না বরং স্বীকৃত গবেষণার ফলাফল সমন্বয় করে। জলবায়ু পরিবর্তনের ভয়াবহতা সম্পর্কে বিশ্বকে জানানোর জন্য নিরলস কাজ করার স্বীকৃতিস্বরূপ আইপিসিসিকে ২০০৭ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন : http://ipcc.ch/

জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক জাতিসঙ্ঘ কর্মকাঠামো সনদ (ইউএনএফসিসিসি)

মানবসৃষ্ট জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব কমানোর উদ্দেশ্যে ১৯৯২ সালে রিও ডি জেনিরোতে অনুষ্ঠিত ধরিত্রী সম্মেলনে United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) গঠনের প্রস্তাব উত্থাপন করা হয় এবং ২১ মার্চ ১৯৯৪ থেকে কার্যকর হয় । এ সনদের উদ্দেশ্য হলো, জলবায়ুর উপর মানুষের বিপজ্জনক হস্তক্ষেপ প্রতিরোধ করার মাধ্যমে বায়ুমণ্ডলে গ্রীনহাউজ গ্যাসের ঘনত্ব নির্দিষ্ট স্তরে স্থির রাখা। ২০১৫ সালের এপ্রিল পর্যন্ত ১৯৬টি দেশ এ সনদে স্বাক্ষর করেছে। সনদে স্বাক্ষরকারী দেশসমূহ প্রতিবছর একবার জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব কমানো বিষয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যে সম্মেলনে মিলিত হয়। এ সম্মেলনকে Conference of Parties (COP) বলা হয়। ২০১৪ সাল পর্যন্ত পক্ষসমূহের ২০টি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য সম্মেলনগুলো হলো, ১৯৯৭ সালের কিয়োটো সম্মেলন (কপ৩), ২০০৭ সালের বালি সম্মেলন (কপ১৩), ২০১০ সালের কানকুন সম্মেলেন (কপ১৬) এবং এ বছর প্যারিসে অনুষ্ঠিতব্য সম্মেলন (কপ২১)। বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন : http://.unfccc.int/

জাতীয় পরিবেশ কমিটি

জাতীয় পরিবেশ নীতি ও পরিবেশ সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা, পরিবেশ ও উন্নয়ন বিষয়ক জাতিসঙ্ঘ সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের বিষয়সমূহ বিবেচনা এবং সরকারের পরিবেশ-সংক্রান্ত নীতিসমূহ বাস্তবায়নে আন্তমন্ত্রণালয় সমস্যাবলী চিহ্নিত করা ও সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সর্বোচ্চ পরিষদ হলো জাতীয় পরিবেশ কমিটি। এ কমিটির সদস্য সংখ্যা ২৯ হলেও তা সম্প্রসারণের সুযোগ রয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কমিটির আহ্বায়ক এবং পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সচিব সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করেন। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী, সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, পরিকল্পনা কমিশন ও বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ কমিটির সদস্য থাকেন। এ কমিটি বছরে কমপক্ষে একবার সভায় মিলিত হয়। জাতীয় পরিবেশ কমিটির কার্যক্রমে সহায়তা করার জন্য পরিবেশ ও বনমন্ত্রীর সভাপতিত্বে একটি নির্বাহী কমিটি কাজ করে থাকে।

জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ মহাপরিকল্পনা

জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাবসমূহ বিবেচনায় রেখে ২০১৫ থেকে ২০৩০ সাল পর্যন্ত জ্বালানি খাতে কার্বন নির্গমন কমানোর উদ্দেশ্যে Energy Efficiency and Conservation Master Plan (EECMP) বা জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ-সম্পদ মন্ত্রণালয়ের টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এসআরইডিএ) ২০১৫ সালের মার্চ মাসে এ মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করে। বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন : http://www.sreda.gov.bd/

নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতি ২০০৮

পৃথিবীব্যাপী জীবাশ্ম জ্বালানির ভবিষ্যত ঘাটতি ও মূল্যবৃদ্ধি বিবেচনায় নিয়ে দেশের জ্বালনি নিরাপত্তা বাড়ানো এবং ২০৫০ সালের মধ্যে বায়ুমণ্ডলে কার্বনের ঘনত্ব বর্তমানের তুলনায় ৮০ শতাংশ হ্রাস করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ-সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বিদ্যুৎ বিভাগ ২০০৮ সালে নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতি প্রণয়ন করে। এ জ্বালানি নীতিতে সৌর, বায়ু, জৈবজ্বালানি, বায়োগ্যাস, পানি, ভূতাপ, নদীর স্রোত, ঢেউ এবং জোয়ারভাটার শক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। এ নীতি অনুসারে ২০১২ সালে টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এসআরইডিএ) গঠন করা হয়। বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন : http://www.powercell.gov.bd

গ্রীন ক্লাইমেট ফান্ড (জিসিএফ)

জলবায়ু-বিপন্ন উন্নয়নশীল দেশগুলোর অভিযোজন ও প্রশমন কর্মসূচিতে অর্থায়ন-সুবিধা দেয়ার জন্য ২০১১ সালে ডারবানে অনুষ্ঠিত জলবায়ু সম্মেলনে Green Climate Fund (GCF) গঠন করা হয়। দক্ষিণ কোরিয়ার ইনচেনে এর সদরদপ্তর অবস্থিত। উন্নয়নশীল দেশ থেকে ১২ জন এবং উন্নত দেশ থেকে ১২ জন, মোট ২৪ জন সদস্য নিয়ে জিসিএফ পরিচালনা পর্ষদ গঠিত। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলার জন্য ২০২০ সাল নাগাদ প্রতিবছর উন্নত দেশগুলোর প্রতিশ্রুত ১০ হাজার কোটি ডলার কার্যকরভাবে ব্যবহার করাই গ্রীন ক্লাইমেট ফান্ড (জিসিএফ)-এর দায়িত্ব। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন : www.greenclimate.fund

সুপার ক্রিটিক্যাল কয়লা-বিদ্যুৎকেন্দ্র

কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে পানি ফুটিয়ে জলীয় বাষ্প তৈরি করা হয় এবং বাষ্পের চাপে টারবাইন ঘোরানোর মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। কয়লা পোড়ানোর গতানুগতিক এই পদ্ধতিতে উৎপন্ন তাপের ৩২ শতাংশ পর্যন্ত ব্যবহার করা সম্ভব হয়। সুপার ক্রিটিক্যাল বিদ্যুৎকেন্দ্রে তাপ ও চাপের এমন মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা হয় যাতে তরল ও বায়বীয় পানির ভারসাম্য বজায় থাকে। ফলে পানির তরল ও বায়বীয় অংশের মধ্যে কোনো ফারাক থাকে না এবং টারবাইনের উপর অধিক পরিমাণে চাপ পড়ে। এ পদ্ধতিতে কয়লা দ্বারা উৎপন্ন তাপের ৪৫ শতাংশেরও বেশি ব্যবহার করা সম্ভব হয়। সুপার ক্রিটিক্যাল বিদ্যুৎকেন্দ্রে বিদ্যুৎ উৎপাদন করলে গতানুগতিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের চেয়ে কম কয়লা প্রয়োজন হয় এবং সে কারণে কম কার্বন নির্গমন হয় এবং মেগাওয়াট-প্রতি উৎপাদন খরচও কমে যায়।

পিকো-সোলার

আন্তর্জাতিক গণনাপদ্ধতি অনুসারে পিকো বলতে দশমিকের পরে ১২ অঙ্কের একক বোঝায়। পিকো'র পূর্ববর্তী একক হলো ন্যানো (দশমিকের পর ৯ অঙ্ক) এবং মাইক্রো (দশমিকের পর ৬ অঙ্ক)। বাংলায় মাইক্রো'র পরিবর্তে 'ক্ষুদ্র' ও ন্যানো'র বদলে 'অতিক্ষুদ্র' শব্দবন্ধ ব্যবহার করা হয়। বাংলায় পিকো'র কোনো সমজাতীয় পরিভাষা নেই। সাধারণত সৌরশক্তি ব্যবহার করে ব্যবহারিক ছোট ছোট যন্ত্র বা যন্ত্রাংশ চালানোর প্রযুক্তিকে পিকো-সোলার বলা হয়। যেমন : সৌরশক্তি-চালিত টর্চলাইট, লণ্ঠন, রেডিও, ফ্যান, মোবাইল ফোন চার্জার ইত্যাদি।

পোল্ডার

নিচুভূমির চারপাশে বাঁধ বা অন্য কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে যে কৃত্রিম জলব্যবস্থা গড়ে তোলা হয় তাকে পোল্ডার বলা হয়। এ ধরনের বাঁধকে বেড়িবাঁধ বলা হয়। এ পদ্ধতির পানি ব্যবস্থাপনায় যান্ত্রিকভাবে সংযোগ না ঘটালে বেড়িবাঁধের ভেতরের সঙ্গে বাইরের জলব্যবস্থার কোনো সম্পর্ক থাকে না। বন্যা ও জলোচ্ছ্বাসের কারণে উপকূলীয় প্লাবনভূমিতে যাতে নোনাপানি ঢুকতে না পারে সে উদ্দেশ্যে ১৯৬০-এর দশকে উপকূলীয় বেড়িবাঁধ প্রকল্প (Coastal Embankment Project-CEP)-এর আওতায় বাংলাদেশের উপকূলব্যাপী ৪ হাজার কিলোমিটার বেড়িবাঁধ দেয়া হয়। ৮০'র দশকের দিকে এসব বেড়িবাঁধের কারণে ব্যাপক জলাবদ্ধতা দেখা দেয়।

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায়

জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অনুমিত অবদান (আইএনডিসি)

এক. জাতীয় প্রেক্ষাপট

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশ ভীষণভাবে বিপন্ন, যদিও দেশটি বৈশ্বিক নির্গমনের মাত্র ০.৩৫ শতাংশ গ্রীনহাউজ গ্যাস নির্গমন করে থাকে[১]। গ্রীনহাউজ গ্যাসের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে আন্তর্জাতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী কার্যক্রম গ্রহণ করা না হলে জলবায়ু অভিযোজনের ভবিষ্যত ব্যয় বর্তমানের তুলনায় কয়েকগুণ বাড়বে। বিশ্বসমাজ উচ্চাকাঙ্ক্ষী কার্যক্রম গ্রহণে ব্যর্থ হলে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের ক্ষতির পরিমাণ ২০৫০ সাল নাগাদ মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদন (জিডিপি)'র ২ শতাংশ এবং ২১০০ সাল নাগাদ ৯.৪ শতাংশ পর্যন্ত হতে পারে[২]। সে কারণেই ভবিষ্যত নির্গমন হ্রাসের সম্মিলিত বৈশ্বিক উদ্যোগের সঙ্গে বাংলাদেশও নিজ ভূমিকা পালন করতে চায়, যা একটি শক্তিশালী ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী আন্তর্জাতিক চুক্তির অংশ হিশেবে অবদান রাখবে।

এরই ধারাবাহিকতায় জলবায়ু পরিবর্তন ব্যবস্থাপনায় দ্বিমূখী কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের জলবায়ু বিষয়ক কার্যক্রমগুলো মূলত জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়াগুলো মোকাবেলায় সহিষ্ণুতা বাড়ানোর উপর আলোকপাত করছে। এর কারণে ইতোমধ্যে দেশের বিপুলসংখ্যক জনগোষ্ঠীর জীবিকা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে আরো ক্ষতি হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ উচ্চ তাপমাত্রা, অনিয়মিত বৃষ্টিপাত, বন্যা, খরা, গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঘূর্ণিঝড়, সমুদ্রপৃষ্ঠের ক্রমবর্ধমান স্ফীতি, জোয়ারোচ্ছ্বাস, লবণ অনুপ্রবেশ ও সমুদ্র-অম্লায়নের কারণে বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষের জীবন ও জীবিকার উপর গুরুতর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে এবং গত ত্রিশ বছরে অর্জিত অসামান্য আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ব্যর্থ হয়ে যাবার পাশাপাশি ভবিষ্যত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিও বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। যাই হোক, নিচুমাত্রায় কার্বন নির্গমন করে অধিকতর জলবায়ু-সহিষ্ণু উন্নয়ন অর্জনের জন্য বাংলাদেশ কাজ করছে। এ কথা মনে রেখে, প্রশমন কার্যক্রম এগিয়ে নিয়ে যাবার মধ্য দিয়ে নিজস্ব ক্রমবর্ধমান নির্গমনের রাশ টানায় অভ্যস্থ হওয়া এবং পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধির পরিমাণ প্রাক শিল্প-বিপ্লব পর্বের তুলনায় ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের – বা অধিকতর কাঙ্ক্ষিত ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার বৈশ্বিক প্রচেষ্টায় নিজ ভূমিকা পালন করাই এই 'জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অনুমিত অবদান' বা আইএনডিসি'র লক্ষ্য।

জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলার বৈশ্বিক প্রচেষ্টায় বাংলাদেশের অবদান বিবেচনায় রেখে, এই অবদানে কতোগুলো প্রশমনমূলক কর্মসূচি নির্ধারণ করা হয়েছে যা দেশের গ্রীনহাউজ গ্যাস নির্গমন নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করবে। এই প্রশমনমূলক উদ্যোগগুলো কার্বন-সাশ্রয়ী ও জলবায়ু-সহিষ্ণু অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার দিকে এগিয়ে যেতে এবং ২০২১ সাল নাগাদ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হতে মূল ভূমিকা পালন করার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের মাথাপিছু নির্গমনের পরিমাণ যেন উন্নয়নশীল বিশ্বের গড় মাথাপিছু নির্গমনের চেয়ে বেশি না হয় সেটি নিশ্চিত করবে। এই অবদানে

---

১. Climate Analysis Indicators Tool (CAIT) Version 2.0. (Washington, DC: World Resources Institute, 2014)". World Resources Institute

২. http://www.adb.org/news/bangladesh-could-see-climate-change-losses-reach-over-9-gdp-report

বিদ্যুৎ, পরিবহণ ও শিল্পখাতের পাশাপাশি ভবিষ্যতে অন্যান্য যেসব খাতে কার্বন নির্গমন কমানোয় বাংলাদেশ অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছে, সেগুলোর জন্য শর্তহীন ও শর্তযুক্ত – উভয় ধরনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। শর্তযুক্ত নির্গমন হ্রাসের লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়ন করার জন্য বাংলাদেশ অর্থায়ন, বিনিয়োগ, প্রযুক্তি উন্নয়ন ও হস্তান্তর এবং সক্ষমতা বাড়াতে আন্তর্জাতিক সহায়তা আশা করে। দেশের বিদ্যমান কৌশলপত্র ও পরিকল্পনাসমূহ, বিশেষত বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশলপত্র ও কর্মপরিকল্পনা (বিসিসিএসএপি), নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতি ২০০৮ (আরইপি), জ্বালানি-দক্ষতা ও সংরক্ষণ মহাপরিকল্পনা (ইইসিএমপি), প্রস্তাবিত জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা (ন্যাপ), জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশলপত্র (এনএসডিএস), রূপকল্প-২০২১'র অধীনে প্রণীত পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন (ডিএমএ) এই আইএনডিসি'র মূল ভিত্তি। এছাড়াও বিদ্যমান পরিকল্পনাসমূহ সম্প্রসারিত করার জন্য ভবিষ্যত বিশ্লেষণ ও পরামর্শ গ্রহণ এবং গ্রীনহাউজ গ্যাস নির্গমনের প্রবণতা, প্রশমন ও অভিযোজনের উপায়সমূহ বিশ্লেষণের পর নেয়া উদ্যোগগুলোও এই অবদানের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে।

নিম্নোক্ত উপাদানসমূহের সমন্বয়ে বাংলাদেশের 'জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অনুমিত অবদান' গঠিত :

- প্রশমন-সংশ্লিষ্ট উপাদান
  - বিদ্যুৎ, পরিবহণ ও শিল্পখাতে গতানুগতিক কার্যক্রম (বিএইউ)'র ফলে যতোটুকু নির্গমন হতো, বিদ্যমান সম্পদ ব্যবহার করে, সেই স্তরের তুলনায় ৫ শতাংশ গ্রীনহাউজ গ্যাস নির্গমন শর্তহীনভাবে কমানো।
  - অর্থায়ন, বিনিয়োগ, প্রযুক্তি উন্নয়ন ও হস্তান্তর এবং সক্ষমতা বাড়ানোয় যথোপযুক্ত আন্তর্জাতিক সহায়তা প্রাপ্তিসাপেক্ষে ২০৩০ সালের মধ্যে বিদ্যুৎ, পরিবহণ ও শিল্পখাতে গতানুগতিক নির্গমন-স্তর থেকে শর্তযুক্ত ১৫ শতাংশ নির্গমন কমানো।
  - আন্তর্জাতিক সম্পদের সংস্থান-সাপেক্ষে অন্যান্য প্রতিশ্রুত খাতে উদ্দীষ্টের অতিরিক্ত আরো কতোগুলো প্রশমন উদ্যোগ গ্রহণ।
- অভিযোজন-সংশ্লিষ্ট উপাদান
  - অভিযোজনে বাংলাদেশের দীর্ঘমেয়াদি স্বপ্নসহ বাংলাদেশ ইতিমধ্যে যা করেছে এবং ভবিষ্যতে যে পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করবে তার রূপরেখা, যা প্রশমনের জন্য গৃহীত পদক্ষেপগুলোর জন্যেও সহায়ক হবে।
- জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অনুমিত অবদান (আইএনডিসি) বাস্তবায়ন
  - আইএনডিসি বাস্তবায়ন, পরিচালনা-পদ্ধতি ও সমন্বয়-সাধন বিষয়ক প্রস্তাবনা এবং পরবর্তী মূল পদক্ষেপসমূহের রূপরেখা।
- আইএনডিসি বাস্তবায়নে সহায়তা
  - বাংলাদেশের প্রয়োজনীয় সহায়তার গুণগত বিবরণ এবং পরিমাণ নির্ধারণের রূপরেখার পাশাপাশি অভিযোজন ও প্রশমন কর্মসূচির ব্যয়-নির্দেশক কয়েকটি উদাহরণ।

অনুমিত জাতীয় অভীষ্ট লক্ষ্য ও ভূমিকা যে কোনো সময় পরিমার্জনের অধিকার বাংলাদেশ কর্তৃক সংরক্ষিত। এই আইএনডিসি একটি জীবন্ত দলিল হিশেবে বিবেচিত হবে এবং পরিবর্তিত/সংশোধিত জাতীয় উন্নয়ন লক্ষ্য ও উদ্দিষ্টের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করবে।

দুই. প্রশমন

২.১ 'গতানুগতিক কার্যক্রম' থেকে নির্গমন

এই সংকল্পপত্র প্রণয়ন-প্রক্রিয়ার অংশ হিশেবে 'গতানুগতিক কার্যক্রম'-এর মাধ্যমে নির্গমনের দৃশ্যকল্প (Scenario) তৈরি এবং মূল তিনটি খাতে (বিদ্যুৎ, পরিবহণ ও শিল্প) জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমনের সম্ভাবনা বিশ্লেষণসহ বাংলাদেশে আগামী দিনের গ্রীনহাউজ গ্যাস নির্গমনের প্রক্ষেপণ হালনাগাদ করা হয়েছে। নির্ভুল উপাত্ত পাওয়া দুঃসাধ্য বিধায় "ভূমি ব্যবহার, ভূমি ব্যবহারে পরিবর্তন ও বনায়ন" (লুলুসিএফ) খাতের নির্গমন কমানোর কোনো মডেল তৈরি করা হয় নি। এ বিষয়ক বিশ্লেষণের বিস্তারিত বিবরণ ভবিষ্যতে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।

২.২ প্রশমনে অবদান প্রসঙ্গে

বিদ্যুৎ, পরিবহণ ও শিল্পখাতে জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমনে বাংলাদেশ অবদান রাখবে। গতানুগতিক কার্যক্রমের দৃশ্যকল্প অনুসারে ২০৩০ সাল নাগাদ মোট নির্গমনের ৬৯ শতাংশই এই তিনটি খাত থেকে হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। ২০১১ সালে এ তিনটি খাতে মোট নির্গমনের পরিমাণ ছিলো ৬.৪০ কোটি টন কার্বন ডাই-অক্সাইডের সমতুল্য যা ২০৩০ সালে ২৬৪ শতাংশ বেড়ে গিয়ে ২৩.৪০ কোটি টনে দাঁড়াবে।

জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমনে বাংলাদেশের প্রত্যাশিত অবদান নিম্নে দেখানো হলো :

ছক ১	জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অনুমিত অবদান - প্রশমন	
শর্তহীন অবদান	অবদান রাখার জন্য কোনো আন্তর্জাতিক সহায়তা আশা করা হচ্ছে না	বিদ্যুৎ, পরিবহণ ও শিল্পখাতে ২০৩০ সাল নাগাদ বাংলাদেশ ১.২০ কোটি টন কার্বন ডাই-অক্সাইডের সমতুল্য গ্রীনহাউজ গ্যাস নির্গমন কমাবে; অথবা এই খাতগুলোর 'গতানুগতিক কার্যক্রম'-এর মাধ্যমে যে নির্গমন হতে পারতো তার তুলনায় ৫ শতাংশ কম নির্গমন করবে।
শর্তযুক্ত অবদান	অবদান রাখার জন্য অধিকতর আন্তর্জাতিক সহায়তা আশা করা হচ্ছে	বিদ্যুৎ, পরিবহণ ও শিল্পখাতে ২০৩০ সাল নাগাদ বাংলাদেশ ৩.৬০ কোটি টন কার্বন ডাই-অক্সাইডের সমতুল্য গ্রীনহাউজ গ্যাস নির্গমন কমাবে; অথবা এই খাতগুলোর 'গতানুগতিক কার্যক্রম'-এর মাধ্যমে যে নির্গমন হতে পারতো তার তুলনায় ১৫ শতাংশ কম নির্গমন করবে।

নির্গমন কমানোর অবদানের চিত্রকল্প নিম্নের লেখচিত্রে দেয়া হলো :

লেখচিত্র ১ — ২০১১-২০৩০ মেয়াদে বিদ্যুৎ, পরিবহণ ও শিল্পখাতে গ্রীনহাউজ গ্যাস নির্গমনের অনুমান (মিলিয়ন টন কার্বন ডাই-অক্সাইডের সমতূল্য)

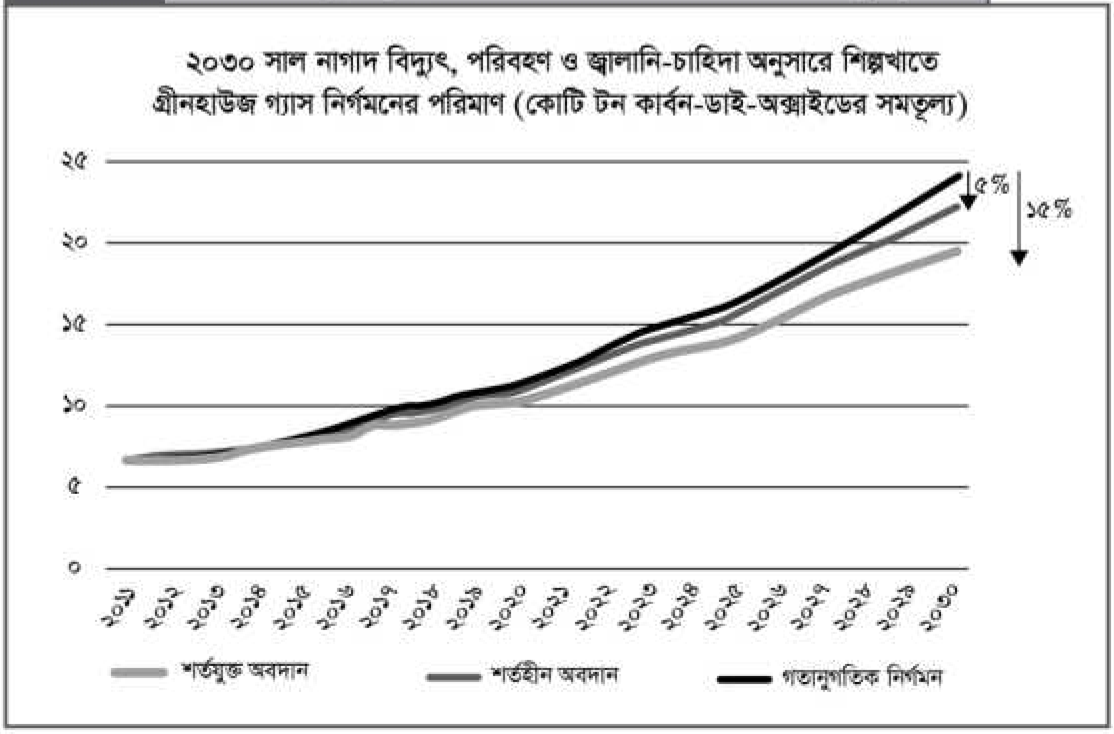

নির্গমন কমানোর প্রক্রিয়া নিম্নের ছক-২তে দেয়া হলো :

ছক ২ — ২০৩০ সাল নাগাদ বিদ্যুৎ, পরিবহণ ও শিল্প (জ্বালানি) খাতে নির্গমন হ্রাসের অনুমান (কোটি টন কার্বন-ডাই-অক্সাইড সমতূল্য)

খাত	ভিত্তি বছর (২০১১)	'গতানুগতিক কার্যক্রমে' গ্রীনহাউজ গ্যাসের পরিমাণ		শর্তহীন অবদান		শর্তযুক্ত অবদান	
		নির্গমন (২০৩০)	পার্থক্য (২০১১-৩০)	অবদানের চিত্রকল্প (২০৩০)	গতানুগতিক নির্গমনের সাথে পার্থক্য	অবদানের চিত্রকল্প (২০৩০)	গতানুগতিক নির্গমনের সাথে পার্থক্য
বিদ্যুৎ	২.১০	৯.১০	৩৩৬%	৮.৬০	-৫%	৭.৫০	-১৮%
পরিবহণ	১.৭০	৩.৭০	১১৮%	৩.৩০	-৯%	২.৮০	-২৪%
শিল্প (জ্বালানি)	২.৬০	১০.৬০	৩০০%	১০.২০	-৪%	৯.৫০	-১০%
মোট	৬.৪০	২৩.৪০	২৬৪%	২২.২	-৫%	১৯.৮০	-১৫%

প্রাপ্ত সর্বোত্তম উপাত্তের উপর ভিত্তি করে ২০১৫ সাল জুড়ে করা বিশ্লেষণের ভিত্তিতে জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অনুমিত অবদানের হার নির্ধারণ করা হয়েছে। অবশ্য, বাংলাদেশে মানসম্পন্ন উপাত্তের

বিষয়টি সবসময়ই প্রশ্নসাপেক্ষ। ভবিষ্যতে আরও নির্ভরযোগ্য উপাত্ত প্রকাশিত হলে অথবা কোনো বিষয়ে অনুমানের পরিবর্তন ঘটলে (যেমন : জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনুমান বা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি) বাংলাদেশ সরকার এ সম্পর্কিত বিশ্লেষণগুলোও হালনাগাদ করবে। নতুন প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্তগুলো বিসিসিএসএপি'র পরবর্তী সংস্করণে সমন্বয় করা হবে এবং জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক জাতিসঙ্ঘ কর্মকাঠামো সনদ (ইউএনএফসিসিসি) সচিবালয়ে জমা দেয়ার জন্য তৈরি করা জাতীয় প্রতিবেদন ও পরবর্তী দ্বিবার্ষিক প্রতিবেদনেও সংযুক্ত হবে।

২.৩ প্রশমন কর্মসূচি

২.২ পরিচ্ছেদে বর্ণিত আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার জন্য ভবিষ্যতে বাস্তবায়ন করা যায় এমন কিছু উদ্যোগ এবং বর্তমানে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন কিছু প্রশমন কর্মসূচির উদাহরণ এই পরিচ্ছেদে উপস্থাপন করা হয়েছে।

২.৩.১ প্রশমনের উদ্দেশ্য

প্রশমনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের কৌশলসমূহ বিসিসিএসএপিতে নির্ধারণ করা হয়েছে। এতে প্রশমন বিষয়ক ৭টি কর্মসূচির কথা বলা হয়েছে :

ছক ৩ বিসিসিএসএপিতে উল্লিখিত প্রশমন কর্মসূচিসমূহ

কর্মসূচি	উদ্দেশ্য
জ্বালানি উৎপাদন ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে উন্নততর জ্বালানি-দক্ষতা	জাতীয় অর্থনীতিতে জ্বালানি নিরাপত্তা ও কার্বন-সাশ্রয়ী উন্নয়ন নিশ্চিত করা
প্রাকৃতিক গ্যাস আবিষ্কার ও গ্যাসক্ষেত্র ব্যবস্থাপনা	জ্বালানি নিরাপত্তা বাড়ানো ও স্বল্প-নির্গমনকারী উন্নয়ন নিশ্চিত করা
কয়লাখনি ও কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র উন্নয়ন	কয়লাজাত উৎপাদন সর্বোচ্চ পর্যায়ে আনা এবং কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো কার্বন-নিরপেক্ষ উপায়ে ব্যবস্থাপনা করা
নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন	গ্রীনহাউজ গ্যাস নির্গমন কমানোর জন্য নবায়নযোগ্য জ্বালানির সর্বোচ্চ ব্যবহার এবং জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা
কৃষিজমি থেকে নির্গমন কমানো	কৃষিজমির উৎপাদন-ক্ষমতা বাড়ানো এবং মিথেন গ্যাস নির্গমন কমানো
নগর-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	গ্রীনহাউজ গ্যাস (মিথেন) নির্গমন কমানোর মাধ্যমে বসবাসযোগ্য নগর নিশ্চিত করা
বনায়ন ও পুনর্বনায়ন কর্মসূচি	বনায়ন ও পুনর্বনায়ন কার্যক্রম শক্তিশালী করার জন্য সহায়তা দেয়া

২.৩.২ বিদ্যমান প্রশমন উদ্যোগসমূহ

গ্রীনহাউজ গ্যাস নির্গমন কমানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে অনেকগুলো কার্যক্রম গ্রহণ করেছে যা ২.২ পরিচ্ছেদে উল্লিখিত শর্তহীন অবদানের প্রতিশ্রুতি পূরণে ভূমিকা পালন করে :

- ২০৩০ সালের মধ্যে ২০১৩ সালের তুলনায় (জিডিপি'র অনুপাতে) জ্বালানি-ঘনত্ব ২০ শতাংশ কমানোর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ (ইইসিএমপি অনুসারে)
- জ্বালানি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি তৈরি এবং অনুমোদিত নিরীক্ষক দ্বারা শিল্প-কারখানার জ্বালানি নিরীক্ষাসহ জ্বালানি ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি গ্রহণ করা
- উচ্চমাত্রার জ্বালানি-সাশ্রয়ী পণ্য বাজারজাতকরণে প্রণোদিত করার উদ্দেশ্যে 'জ্বালানি-সাশ্রয়ী' মোড়ক প্রবর্তনের কর্মসূচি গ্রহণ করা
- উষ্ণীকরণ ও শীতলীকরণ ব্যবস্থাসহ জ্বালানি-সাশ্রয়ী ভবন নির্মাণ করা এবং নতুন ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে জ্বালানি-সাশ্রয় নিয়ামবলী প্রণয়ন করা
- 'সৌরশক্তিভিত্তিক বাড়ি' কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জন্য সরবরাহ-লাইন বহির্ভূত বিদ্যুৎব্যবস্থার সুবিধা নিশ্চিত করা
- দেশের মোট জ্বালানির ২০১৫ সালের মধ্যে ৫ শতাংশ ও ২০২০ সালের মধ্যে ১০ শতাংশ নবায়নযোগ্য উৎস থেকে সরবরাহ করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা (নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতি, ২০০৮)
- ইতোমধ্যে সারাদেশে ১৫ লাখেরও বেশি 'উন্নত চুলা' ও ৪০ লাখ গৃহভিত্তিক সৌরবিদ্যুৎ প্যানেল বিতরণ করা হয়েছে
- ইটশিল্পে ব্যবহৃত ভাটাগুলোর জ্বালানি-সাশ্রয় বাড়ানো, জৈববর্জ্যের সার উৎপাদন এবং জৈববর্জ্যভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করা
- সরকার ও ইউটিলিটি কোম্পানিগুলোর যৌথ উদ্যোগে সমন্বিত আবর্তনের বিদ্যুৎকেন্দ্র (সিসিপিপি) প্রবর্তন করা
- ছাদভিত্তিক সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পের আওতায় সরকারি ও বেসরকারি ভবনের ফাঁকা ছাদে স্থাপিত সৌরবিদ্যুৎ প্যানেল থেকে প্রায় ১৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে
- সৌরচালিত সেচপাম্পের সম্ভাবনা ব্যবহারের জন্য বাংলাদেশ ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে
- বিদ্যুৎ-সরবরাহ লাইনের বাইরে থাকা জনগোষ্ঠীর জন্য ক্ষুদ্র ও অতিক্ষুদ্র সৌরবিদ্যুৎ সরবরাহ-জাল তৈরি করা

২.৩.৩ বিদ্যুৎ, শিল্প ও পরিবহন খাতে সম্প্রসারিত প্রশমন উদ্যোগ

২.২ পরিচ্ছেদে বর্ণিত শর্তযুক্ত অবদানসমূহ নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশের কিছু সম্প্রসারিত প্রশমন উদ্যোগ বাস্তবায়ন করতে হবে। এ সম্পর্কিত উদ্যোগের কিছু উদাহরণ ছক ৪-এ উপস্থাপন করা হলো। এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে প্রস্তাবিত আইএনডিসি বাস্তবায়নের পথনকশার

(পরিচ্ছেদ-৪ দেখুন) অংশ হিশেবে এবং অর্থায়ন সহায়তা ও আভ্যন্তরীণ সক্ষমতার উপরে ভিত্তি করে এসব সুযোগ ও কার্যক্রমগুলো আরো বিস্তারিত জেনে বিবেচনার জন্য বিশ্লেষণ করা হবে।

ছক ৪ শর্তযুক্ত অবদানের আওতায় সম্ভাবনাময় প্রশমন-উদ্যোগ

খাত	বিবরণ	২০৩০ সালে অর্জনযোগ্য উদ্দেশ্য
বিদ্যুৎ	■ সকল নতুন বিদ্যুৎকেন্দ্রে সুপার-ক্রিটিক্যাল প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করা। ■ বায়ুচালিত বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের হার বাড়ানো। ■ বিদ্যমান বিদ্যুৎ উৎপাদন-ব্যবস্থায় বৈচিত্র্য আনার জন্য সরবরাহ লাইনে সৌরবিদ্যুৎ-সংযোগ দেয়া।	■ ১০০ শতাংশ নতুন বিদ্যুৎকেন্দ্রে সুপার-ক্রিটিক্যাল প্রযুক্তি ব্যবহৃত হবে। ■ বায়ুচালিত বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে ৪০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হবে। ■ সৌরবিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে ১ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ করা যাবে।
পরিবহণ	■ নগর-এলাকায় পাতাল রেল ও দ্রুতগামী বাস চালু করাসহ অন্যান্য উদ্যোগের মাধ্যমে পরিবহণের ধরন পরিবর্তন করা। উপজাত হিশেবে যানজট, বায়ুদূষণ ও সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসে সুফল পাওয়া যাবে। ■ যানজট কমানো ও দ্রুততর যাতায়াত নিশ্চিত করা। এ উদ্দেশ্যে এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ ও গণ-পরিবহন ব্যবস্থার পরিবর্তনসহ অন্যান্য উদ্যোগ গ্রহণ করা।	■ সড়কের চেয়ে রেলের যাত্রী পরিবহণের হার গতানুগতিক অবস্থার তুলনায় ২০ শতাংশ বাড়বে। ■ দ্রুততর চলাচলের কারণে যানবাহনের কার্যকারিতা ১৫ শতাংশ বাড়বে।
শিল্প (জ্বালানি-সংশ্লিষ্ট)	■ জ্বালানি ব্যবহারে কার্যকারিতা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে জ্বালানি নিরীক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তন এবং বাংলাদেশ জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ মহাপরিকল্পনা অনুসারে প্রধান প্রধান শিল্পখাতে জ্বালানি সংরক্ষণে প্রণোদনা দেয়া।	■ শিল্পখাতে জ্বালানি খরচ গতানুগতিক কার্যক্রমের তুলনায় ১০ শতাংশ কমবে।

২.৩.৪ অন্যান্য খাতে সম্প্রসারিত প্রশমন উদ্যোগ

শুরুতেই বলা হয়েছে যে, বিদ্যুৎ, পরিবহণ ও শিল্প ব্যাতীত অন্যান্য খাতসমূহের পর্যাপ্ত নির্ভুল উপাত্ত এই মুহূর্তে প্রস্তুত নেই। তাই অন্যান্য খাতগুলোয় জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমনের পরিমাণগত অবদান উল্লেখ করা হয় নি এবং তা নিরূপণ করা বা প্রশমনের সম্ভাবনা নির্ধারণ এ মুহূর্তে অত্যন্ত দুরূহ। তথাপি বিদ্যুৎ, পরিবহণ ও শিল্প ব্যাতীত অন্যান্য খাতে বিসিসিএসএপি'র আওতায় উন্নততর বিশ্লেষণের জন্য আগামীতে কাজ করা হবে। এই দলিলে সুনির্দিষ্ট পরিমাণ উল্লেখ করা না গেলেও বাংলাদেশ এসব খাতে প্রশমনের কর্মসূচি গ্রহণ করা চলমান থাকবে। অন্য খাতগুলোতে বিবেচনাযোগ্য কয়েকটি সম্ভাবনাময় উদ্যোগের উদাহরণ নিম্নে দেয়া হলো :

ছক ৫ অন্যান্য খাতে সম্ভাব্য শর্তযুক্ত কার্যক্রমভিত্তিক অবদানসমূহ

খাত	বিবরণ	২০৩০ সালে অর্জনযোগ্য উদ্দেশ্য
গৃহস্থালি	▪ উন্নততর (অধিকতর জ্বালানি সাশ্রয়ী) গ্যাসের চুলা প্রবর্তনে প্রণোদনা দেয়ার নীতি প্রণয়ন করা; ▪ রান্নার জন্য জৈবজ্বালানি (biomass)'র বদলে তরল পেট্রোলিয়াম গ্যাস (LPG) ব্যবহারে সহায়তা দেয়া; ▪ জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ মহাপরিকল্পনা অনুসারে গৃহস্থালি পর্যায়ে জ্বালানি দক্ষতা বৃদ্ধি ও সংরক্ষণের জন্য নীতি প্রণয়ন ও সহায়তা কার্যক্রম গ্রহণ করা।	▪ ২ কোটি গৃহস্থালিতে উন্নততর জৈবজ্বালানির চুলা ব্যবহৃত হবে যার মাধ্যমে এ ধরনের চুলা বাজারের ৭০ শতাংশ দখল করবে ▪ উন্নততর গ্যাসের চুলা বাজারের ৪০ শতাংশ অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করবে ▪ রান্নার জন্য জৈবজ্বালানি থেকে এলপিজি চুলায় রূপান্তরের হার গতানুগতিক কার্যক্রমের তুলনায় বাজারে ১০ শতাংশ বেশি হবে।
বাণিজ্যিক ভবন	▪ জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ মহাপরিকল্পনা অনুসারে বাণিজ্যিক খাতে জ্বালানি দক্ষতা বৃদ্ধি ও সংরক্ষণের জন্য নীতি প্রণয়ন ও সহায়তা কার্যক্রম গ্রহণ করা; ▪ পানি ও জ্বালানি সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে বাণিজ্যিক ভবনে বৃষ্টির পানি ধারণ ও ব্যবহারে প্রণোদনা দেয়ার নীতি গ্রহণ করা।	▪ বাণিজ্যিক খাতে গতানুগতিক কার্যক্রমের তুলনায় সার্বিক জ্বালানি ব্যবহারের পরিমাণ ২৫ শতাংশ কমবে।

খাত	বিবরণ	২০৩০ সালে অর্জনযোগ্য উদ্দেশ্য
কৃষি (জ্বালানি বহির্ভূত)	▪ চাষাবাদে ব্যবহৃত গরুর সংখ্যা কমানোর উদ্দেশ্যে কৃষিখাতে যান্ত্রিকীকরণ বাড়ানো (ফলে মিথেন নির্গমনের পরিমাণ কমবে); ▪ ব্যবহৃত সারের মিশ্রণে জৈবসারের অংশ বাড়ানো; ▪ ধানচাষের জমিতে 'সেচ-আবর্তন' (এডাব্লিউডি) পদ্ধতির ব্যবহার বাড়ানো।	▪ গতানুগতিক অবস্থার তুলনায় চাষাবাদে ব্যবহৃত গবাদি-পশুর সংখ্যা ৫০ শতাংশ কমে যাবে; ▪ গতানুগতিক অবস্থার তুলনায় জৈবসার ব্যবহারের পরিমাণ ৩৫ শতাংশ বাড়বে; ▪ ধানচাষের মোট জমির ২০ শতাংশে 'সেচ-আবর্তন' (এডাব্লিউডি) পদ্ধতিতে সেচ দেয়া হবে।
বর্জ্য	▪ জৈববর্জ্যের কম্পোস্ট সার তৈরির হার বাড়ানো; ▪ ভূমি ভরাটের বর্জ্য থেকে গ্যাস আহরণ ও বিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রণোদনা দেয়া।	▪ ব্যবস্থাপনার আওতাধীন বর্জ্যের ৫০ শতাংশ ভূমি ভরাট থেকে কম্পোস্ট সার তৈরিতে স্থানান্তরিত হবে। ▪ ভূমি ভরাটের ৭০ শতাংশ গ্যাস বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য আহরণ করা হবে।
ভূমি ব্যবহার, ভূমি ব্যবহারে পরিবর্তন ও বনায়ন (লুলুসিএফ)	▪ উপকূলীয় বাদাগাছ রোপণের কর্মসূচি বহাল রাখা; ▪ সংরক্ষিত বনে বনায়ন ও পুনর্বনায়ন করা; ▪ চর ও দ্বীপসমূহে বনায়ন করা; ▪ সামাজিক ও বসতবাড়ি-ভিত্তিক বনায়ন বহাল রাখা।	▪ ফলাফলের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয় নি।

২.৪ সংজ্ঞায়ন, স্বচ্ছতা ও ধারণা উন্নয়নের জন্য তথ্যায়ন

২.২ পরিচ্ছেদে নির্ধারিত জাতীয় অবদানের বিস্তারিত বিবরণ এবং প্রয়োজনীয় তথ্যাবলীর জন্য করা বিশ্লেষণসমূহ এই পরিচ্ছেদে দেয়া হয়েছে।

ছক ৬	সংজ্ঞায়ন, স্বচ্ছতা ও ধারণা উন্নয়নের তথ্যাবলী
বাস্তবায়নের সময়সীমা এবং/অথবা মেয়াদ	
বাস্তবায়নের সময়সীমা	বাংলাদেশের জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অনুমিত অবদান (আইএনডিসি) বাস্তবায়নের সময়সীমা ২০২০ থেকে ২০৩০ সাল পর্যন্ত
সুযোগ ও পরিসর	
অবদানের আওতাভূক্ত গ্যাসসমূহ	কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2), মিথেন (CH_4), নাইট্রাস অক্সাইড (N_2O), হাইড্রোফ্লুওরোকার্বন (HFCs), পারফ্লুরোকার্বন (PFCs) এবং সালফার হেক্সাফ্লুওরাইড (SF_6)
অবদানের আওতাভূক্ত খাতসমূহ	বিদ্যুৎ খাত এবং পরিবহণ ও শিল্পখাতে জ্বালানি ব্যবহারের পরিমাণ এই অবদানে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। অন্যান্য খাতগুলোকে পরিমাণগত অবদান অন্তর্ভূক্ত করা না হলেও শর্তযুক্ত অবদানের মধ্যে কর্মসূচি হিশেবে রাখা হয়েছে।
অবদানের আওতাভূক্ত ভৌগলিক এলাকা	সমগ্র বাংলাদেশের ভৌগলিক এলাকা এই অবদানের আওতাভূক্ত
পূর্বানুমান ও পদ্ধতিগত প্রক্রিয়া	
বর্তমান ও ভবিষ্যত নির্গমনের পরিমাণ নির্ধারণের পদ্ধতি	১৯৯৬ সালে প্রণয়নকৃত 'জাতীয় গ্রীনহাউজ গ্যাস পরিসংখ্যার নির্দেশিকা' জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক আন্তসরকারি প্যানেল (আইপিসিসি) পরিমার্জন করেছে এবং বর্তমান ও ভবিষ্যত নির্গমনের পরিমাণ হিসাব করার জন্য 'সুকীর্তি ও জাতীয় গ্রীনহাউজ গ্যাস পরিসংখ্যার অনিশ্চয়তা ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা' (Good Practise Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse Gas Inventories) ব্যবহার করছে। ২০২১ সালে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবার লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গ্রীনহাউজ গ্যাস নির্গমনের পরিমাণ অনুমান করা হয়েছে। প্রত্যেকটি খাতে প্রাপ্ত উপাত্তের উপর ভিত্তি করে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করেই হিসাব করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, যানবাহনের সংখ্যা, ভ্রমণের দূরত্ব এবং ব্যবহৃত জ্বালানির কার্যকারিতা বিষয়ক উপাত্তসমূহ সমন্বিত করে তুলনামূলকভাবে অন্য খাত থেকে পৃথকীকরণের মাধ্যমে পরিবহণ খাতে গ্রীনহাউজ গ্যাস নির্গমনের পরিমাণ হিসাব করা হয়েছে। একইভাবে, নিম্ন থেকে উচ্চস্তর পর্যন্ত বিস্তারিত উপাত্ত সংগ্রহ এবং অনুমিত বৈদ্যুতিক উপকরণ ও সেগুলোর কার্যকারিতা বিবেচনায় নিয়ে বসতবাড়িতে বিদ্যুৎ ব্যবহারের কারণে কতোটুকু গ্রীনহাউজ গ্যাস নির্গমন হতে পারে তার হিসাব করা হয়েছে।

	অন্যদিকে, প্রতিটি শিল্প উপখাতে মোট জ্বালানি চাহিদা ও ভবিষ্যত উৎপাদনের পূর্বাভাস ব্যবহার করে শিল্পখাতে গ্রীনহাউজ গ্যাস নির্গমনের হিসাব করা হয়েছে। প্রাসঙ্গিক কার্যক্রমের উপাত্ত ও নির্গমনের কারণগুলো বিশ্লেষণ এবং দীর্ঘমেয়াদি বিকল্প জ্বালানি পরিকল্পনা (লীপ) মডেল ব্যবহার করে ভবিষ্যত নির্গমনের পরিমাণ হিসাব করা হয়েছে।
বৈশ্বিক উষ্ণায়নের সম্ভাবনা	আইপিসিসি প্রণীত ১৯৯৬ সালের গাইডলাইন অনুসারে আগামী ১০০ বছরের বৈশ্বিক উষ্ণায়নের সম্ভাবনার মডেল ব্যবহার করে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও তার সমপরিমাণ অন্যান্য গ্যাসের পরিমাণ নিরূপণ করা হয়েছে।
ভূমিভিত্তিক নির্গমন পরিমাপের প্রক্রিয়া	লুলুসিএফ খাতে গ্রীনহাউজ গ্যাস নির্গমনের ভবিষ্যত পরিমাণ নির্ধারণ ও প্রশমনের সম্ভাবনা বিষয়ে বিস্তারিত বিশ্লেষণ করার মতো পর্যাপ্ত উপাত্ত ছিলো না। এ বিষয়ে সঠিক পরিমাণগত বিশ্লেষণ করার জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে (আইএনডিসি বাস্তবায়ন বিষয়ক পরিচ্ছেদ-৪ দেখুন)।
সংশ্লেষণ ও প্রাপ্ত সহ-সুফলসমূহ	প্রশমন-উদ্যোগের যে সংক্ষিপ্ত তালিকা এই আইএনডিসি'তে বিশ্লেষণ করা হয়েছে সেগুলো একটি দীর্ঘ তালিকা থেকে সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড প্রয়োগের মাধ্যমে বাছাই করা হয়েছে। মানদণ্ডগুলোর একটি হলো 'প্রাপ্ত সহ-সুফলসমূহ'। অবদানের আওতাভূক্ত সবগুলো উদ্যোগেরই সহ-সুফল থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে। সুফলগুলোর মধ্যে রয়েছে বায়ুর গুণগত মান উন্নয়ন (নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার বৃদ্ধি ও যানজট হ্রাস), সড়কের নিরাপত্তা বৃদ্ধি (গণপরিবহনের মাধ্যম পরিবর্তন ও যানজট হ্রাস), সবুজ-কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে প্রাপ্ত সুফল, পরিবারের ব্যয় হ্রাস (গাড়ি ব্যবহার হ্রাস ও জ্বালানি-সাশ্রয়ী উপকরণ ব্যবহার) এবং জ্বালানি প্রাপ্তির সুবিধা বৃদ্ধি (স্থানীয় বায়োগ্যাস উৎপাদন)। প্রশমন ও অভিযোজনের সংশ্লেষণ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যের জন্য পরিচ্ছেদ-৩ দেখুন।
আন্তর্জাতিক বাজারভিত্তিক জলবায়ু ব্যবস্থায় প্রকৃত অবদান	ইতোমধ্যে গৃহীত বাণিজ্য-প্রক্রিয়া ও হিসাব সংশ্লিষ্ট নিয়মাবলীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গৃহীত আন্তর্জাতিক বাজারভিত্তিক ব্যবস্থা বাংলাদেশ অস্বীকার করে না।

২.৫ ন্যায্য ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী লক্ষ্য

বাংলাদেশ একটি স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) যার মোট নির্গমনের পরিমাণ বিশ্বের মোট নির্গমনের ০.৩৫ শতাংশেরও কম। বাংলাদেশ স্বীকার করে যে, বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির হার ২ ডিগ্রির কম রাখার উদ্দেশ্য পূরণ করার জন্য আইপিসিসি'র নির্দেশনা অনুসারে পৃথিবীর সকল দেশের জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমনের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। এ উদ্দেশ্য সফল করতে হলে ২০৫০ সালের মধ্যে মানবসৃষ্ট গ্রীনহাউজ গ্যাস নির্গমন ২০১০ সালের তুলনায় ৪০ থেকে ৭০ শতাংশ কমাতে হবে। বাংলাদেশের দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য হলো, উন্নয়নশীল দেশের গড় মাথাপিছু নির্গমনের চেয়ে জাতীয় মাথাপিছু নির্গমন বেশি হবে না, যা ইতোমধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন। সুতরাং, মাথাপিছু নির্গমনের উল্লেখিত সীমা অতিক্রম না করে জাতীয় উন্নয়নের লক্ষ্যসমূহ অর্জনের পথ বের করার উপরই বাংলাদেশ আলোকপাত করছে।

যদিও বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থান স্বল্পোন্নত দেশের কাতারে এবং ঐতিহাসিক ও বর্তমান বৈশ্বিক নির্গমনে দায় খুবই সামান্য, তথাপি বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশ বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করছে যা দেশটিকে স্বল্প-কার্বন নির্গমনকারী উন্নয়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। এই দলিলের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে এবং বিদ্যমান প্রচেষ্টা অতিক্রম করার জন্য জলবায়ু বিষয়ক লিমা ঘোষণা (এলসিসিএ)-এর শর্তাবলী পূরণ করছে। এই প্রতিশ্রুতির আওতায় গৃহীত কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়ন করতে হলে অর্থায়ন, প্রযুক্তি হস্তান্তর ও সক্ষমতা বাড়ানোর মতো খাতগুলোতে আন্তর্জাতিক সহায়তা প্রয়োজন হবে। জাতীয় আর্থিক সম্পদ, জনবলের সময় এবং উন্নয়ন ও প্রশমনের মধ্যে শক্তিশালী সমন্বয়ের উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশও এ বিষয়ে প্রাসঙ্গিক ভূমিকা পালন করবে।

প্রশমন কার্যক্রম নির্বাচন করার ক্ষেত্রে সেগুলোকেই অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে যেগুলো জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার সঙ্গে খাপ খায়। এছাড়া, প্রশমন ও অভিযোজন কার্যক্রম সংশ্লেষণের সময় অভিযোজনের মাধ্যমে প্রশমনেও সুনির্দিষ্ট সহ-সুফল পাওয়া যাবে শুধুমাত্র এই যুক্তিতেই অগ্রাধিকার দেয়া হয় নি বরং সার্বিকভাবে অভিযোজনের ফলে সৃষ্ট কার্বন পদচিহ্নের হিস্যা যেন সর্বনিম্ন পর্যায়ে থাকে সেটিও বিবেচনায় রাখা হয়েছে। ভবিষ্যতে গ্রহণ করা হবে এমন কর্মসূচির সঙ্গে ইতোমধ্যে বাংলাদেশের নিজস্ব অর্থায়নে গৃহীত কর্মসূচিগুলোও এই আইএনডিসি'তে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে যাতে এটা প্রমাণিত হয় যে, বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার জন্য আন্তর্জাতিক সহায়তার জন্য অপেক্ষা করছে না।

তিন. অভিযোজন

৩.১ বিপন্নতার ভিত্তিতে বাংলাদেশের অবস্থা

বাংলাদেশ পৃথিবীর সর্বোচ্চ দুর্যোগপ্রবণ ও জলবায়ু-বিপন্ন দেশগুলোর একটি এবং স্বাধীন জাতি হিশেবে অল্পদিনের ইতিহাসেই অন্তত ডজনেরও বেশি ভয়াবহ দুর্যোগের মুখোমুখি হয়েছে। বঙ্গোপসাগরের মুখেই বাংলাদেশের অবস্থান যা উপসাগরটিকে ভারত মহাসাগরের ভারী বৃষ্টিপাত ও আবহাওয়ার বিরূপ ঘটনাবলী আকর্ষণের উপযোগী ফানেলে পরিণত করেছে। এই ভৌগলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ নিয়মিত গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঘূর্ণিঝড়ের সহজ শিকারে পরিণত হয়। হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল থেকে ধেয়ে আসা কয়েকটি বৃহৎ নদীর প্লাবনভূমি হওয়ায় মৌসুমি বন্যা দেখা দেয় এবং তা ঘূর্ণিঝড়ের মৌসুমের সঙ্গে যুগপৎভাবে ঘটে থাকে। বর্তমান গবেষণা ও অধ্যয়নে আশঙ্কা করা হচ্ছে যে, আগামী দিনগুলোতে বন্যা, গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও খরা আরো পৌনপুনিক ও তীব্র হবে। জলবায়ু বিপন্নতা সূচকে (সিসিভিআই ২০১১) ১৭০টি দেশের উপর আগামী ৩০ বছরে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বিশ্লেষণ করা হয়েছে[৩]। এ সূচকের ফলাফল অনুসারে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সবথেকে বিপন্ন দেশটি হলো বাংলাদেশ।

জলবায়ু অভিযোজনই বাংলাদেশের মূল অগ্রাধিকার এবং ইতোমধ্যে পানিসম্পদ, স্বাস্থ্য, বনায়ন, কৃষি ও অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো-সংশ্লিষ্ট খাতগুলোতে অভিযোজনের বিষয়টি জাতীয় উন্নয়নের মূলধারায় নিয়ে আসা হয়েছে। বাংলাদেশের জনগণ ইতোমধ্যেই বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, খরা ও নদীভাঙনসহ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবগুলোর মুখোমুখি হতে শুরু করেছে। দৃষ্টান্ত হিশেবে বলা যায়, ২০০৭ সালের বন্যায় ৩২ হাজার বর্গ কিমি এলাকা প্লাবিত হয়ে যায়, যার ফলে ৮৫ হাজার ঘর ভেঙে পড়ে, প্রায় ১০ লাখ বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ১২ লাখ একর জমির ফসল সম্পূর্ণরূপে বা আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ৬৪৯ জন মানুষ মারা যায়। আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ছিলো ১০০ কোটি ডলারেরও বেশি। জলবায়ু পরিবর্তন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মারাত্মক ক্ষতিসাধন করবে। উদাহরণস্বরূপ, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)'র প্রাক্কলন অনুসারে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ২০৫০ সাল নাগাদ বাংলাদেশ প্রতিবছর জিডিপি'র ২ শতাংশ ক্ষতির শিকার হবে।

৩.২ অভিযোজনের লক্ষ্য

অভিযোজনের প্রাথমিক লক্ষ্য হলো বাংলাদেশের জনসাধারণকে রক্ষা করা, অভিযোজন-ক্ষমতা ও জীবিকায়নের উপায়সমূহ বাড়ানো, এবং দ্রুতগতিতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ও জনকল্যাণের মধ্য দিয়ে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের সুরক্ষা নিশ্চিত করা।

৩.৩ অভিযোজন-উদ্যোগ : অতীত ও বর্তমান

অধিকতর জলবায়ু-সহিষ্ণুতা অর্জন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিপন্নতা কমানোর জন্য বিগত তিন দশকে বাংলাদেশ সরকার ১ হাজার কোটি ডলার (২০০৭ সালের স্থিরমূল্যে) ব্যয় করেছে। বন্যা

[৩]. http://maplecroft.com/about/news/ccvi.html

ব্যবস্থাপনার বেড়িবাঁধ, উপকূলীয় পোল্ডার ও ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে এবং বাংলাদেশের অস্থির ও গতিশীল পানিব্যবস্থার মধ্যে এবং সমাজের অংশগ্রহণের মাধ্যমে কীভাবে এসব প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়ন করা যায় সে সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ শিখন গ্রহণ করা হয়েছে।

জাতীয় সকল প্রধান নীতিমালা ও খাতে জলবায়ু অভিযোজনমূলক কর্মসূচি গ্রহণের হার বাড়ানোর উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব বাজেট থেকে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট তহবিল (বিসিসিটিএফ) এবং উন্নয়ন-সহযোগীদের সহায়তায় বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণুতা তহবিল (বিসিসিআরএফ) নামে দুটো নতুন তহবিল চালু করা হয়েছে। বাংলাদেশ ২০০৫ সালে জাতিসঙ্ঘে জাতীয় অভিযোজন কর্মপরিকল্পনা (নাপা, ২০০৯ সালে পরিমার্জিত) পেশ করেছে এবং জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশলপত্র ও কর্মপরিকল্পনা - বিসিসিএসএপি) প্রণয়ন করেছে।

৩.৪ ভবিষ্যত আকাঙ্ক্ষা : স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা ও কর্মসূচি

জলবায়ু-বিপন্নতা বিবেচনায় নিয়ে এর বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় কর্মসূচি গ্রহণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সরকার নিম্নোক্ত খাতগুলো চিহ্নিত করেছে :

জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলা করার প্রধান প্রধান খাত
১. খাদ্য নিরাপত্তা, জীবিকা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা (পানি নিরাপত্তাসহ)
২. সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা
৩. উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা (লবণাক্ততা অনুপ্রবেশ নিয়ন্ত্রণসহ)
৪. বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নদীভাঙন প্রতিরোধ
৫. জলবায়ু-সহিষ্ণু অবকাঠামো নির্মাণ
৬. পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ
৭. জলবায়ু-সহিষ্ণু নগর গঠন
৮. প্রতিবেশভিত্তিক অভিযোজন (বনায়নের সহ-ব্যবস্থাপনাসহ)
৯. সমাজভিত্তিক জলাভূমি ও উপকূলীয় এলাকা ব্যবস্থাপনা
১০. জাতীয় নীতিমালা ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি

উল্লিখিত খাতগুলোর উপর ভিত্তি করে ব্যাপকার্থে বাংলাদেশের অগ্রাধিকারভিত্তিক অভিযোজন কর্মসূচিগুলো নিম্নরূপ :

বাংলাদেশের অগ্রাধিকারভিত্তিক অভিযোজন কর্মসূচি
১. গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, ঢলজনিত বন্যা ও খরার উন্নততর আগাম সতর্কীকরণ
২. দুর্যোগ প্রস্তুতি-ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ
৩. গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস প্রতিরোধ
৪. আভ্যন্তরীণ মৌসুমি বন্যা-সহিষ্ণুতা সৃষ্টি ও প্রতিরোধ
৫. জলবায়ু-সহিষ্ণু অবকাঠামো ও যোগাযোগ উন্নয়ন
৬. জলবায়ু-সহিষ্ণু আবাসন নির্মাণ
৭. নগর-বন্যা মোকাবেলায় নিষ্কাশনব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে নগরে জলবায়ু-সহিষ্ণুতা বৃদ্ধি
৮. নদীশাসন ও খনন (জলাধার, খাল ও নালা খননসহ)
৯. ঘাতসহিষ্ণু (লবণাক্ততা, খরা ও বন্যা) জাত উদ্ভাবন ও চাষ (গবাদিপশু ও মৎস্যসহ)
১০. গবেষণা ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা
১১. স্থানীয় প্রেক্ষিতসহ অন্যান্য অভিযোজন
১২. স্বাস্থ্যের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের সঙ্গে অভিযোজন
১৩. প্রাণবৈচিত্র্য ও প্রতিবেশ সংরক্ষণ
১৪. জলবায়ু অভিযোজন কর্মসূচি ও প্রকল্পের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে সক্ষমতা বৃদ্ধি

দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু অভিযোজন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে ইতোমধ্যেই জলবায়ু-উদ্ভূত বিপন্নতা মোকাবেলায় বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অবকাঠামো নির্মাণ ও সক্ষমতা অর্জন সম্ভব হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে অভিযোজন এবং জীবন ও জীবিকার নিরাপত্তা বিধানের জন্য বর্তমানে চালু জাতীয় উদ্যোগগুলো অধিকতর গতিশীল করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সরকার

বিসিসিটিএফ-এ প্রায় ৪০ কোটি ডলার বরাদ্দ দিয়েছে। ২০১৫ সালের জুন মাস পর্যন্ত বিসিসিটিএফ থেকে ২৩৬টি প্রকল্পে অর্থায়ন করা হয়েছে যার মধ্যে ৪১টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন ইতোমধ্যেই সম্পন্ন। বিসিসিটিএফ-এর আওতায় গৃহীত প্রকল্পগুলোর মধ্যে কয়েকটি হলো :

- বেড়িবাঁধ নির্মাণ ও নদীতীর-রক্ষা কার্যক্রম;
- ঘূর্ণিঝড়-সহনশীল গৃহনির্মাণ, খালখনন/পুনর্খনন
- স্লুইস গেট ও রেগুলেটরসহ পানি-নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো
- ঘাতসহিষ্ণু ফসলের জাত উদ্ভাবন ও বীজ বিতরণ, বনায়ন
- সৌরবিদ্যুৎ প্যানেল স্থাপন

জলবায়ু অভিযোজনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অর্জনসমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা নেয়ার জন্য অনুগ্রহ করে পরিশিষ্ট-১ দেখুন

উল্লেখযোগ্য সংখ্যক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের পাশাপাশি বিসিসিটিএফ-এর বরাদ্দও রাজস্ব বাজেট থেকে দেয়া হয় (২০১৩-১৪ অর্থবছর)। ফলে উন্নয়ন কার্যক্রমের বরাদ্দ মোট জাতীয় বাজেটের ৩২ শতাংশে দাঁড়ায়। বিসিসিটিএফ-এর ওয়েবসাইটে বরাদ্দকৃত প্রকল্পের হালনাগাদ তালিকা দেয়া হয়ে থাকে[৪]।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি), পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো), বাংলাদেশ আভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ কর্তৃপক্ষ (বিআইডাব্লিউটিএ), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক মন্ত্রণালয় (এমওডিএম), সড়ক ও জনপথের মহাসড়ক বিভাগ, সড়ক যোগাযোগ ও সেতু মন্ত্রণালয়ের মতো বিভিন্ন দপ্তরের মাধ্যমেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জলবায়ু অভিযোজন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হয়। অনুগ্রহ করে বিস্তারিত জানার জন্য পরিশিষ্ট-১ দেখুন।

এছাড়াও অভিযোজনের সক্ষমতা ও সহিষ্ণুতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের বিপন্নতা কমানোর লক্ষ্যে একটি সমন্বিত জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা (ন্যাপ) প্রণয়নের জন্য বাংলাদেশ একটি পথনকশা তৈরি করেছে। প্রণীত অভিযোজন পরিকল্পনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিদ্যমান ও নতুন জাতীয় নীতিমালা, কর্মসূচি ও কার্যক্রমের সঙ্গে, বিশেষত, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট সকল খাত ও পর্যায়ের উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রক্রিয়া ও কৌশলের সঙ্গে জলবায়ু অভিযোজনের বিষয়টি সমন্বিত করা সম্ভব হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

বাংলাদেশকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নেতৃত্বদানকারী দেশগুলোর একটি হিশেবে বিবেচনা করা হয় এবং বছরের পর বছর চর্চার মধ্য দিয়ে জলবায়ু অভিযোজনের অনেকগুলো সুকীর্তি ও শিখন অর্জন ও প্রয়োগ করা হয়েছে।

৪. http://www.bcct.gov.bd/images/180814/Updated%20Project%20List%2017.11.pdf

৩.৫ বাধা ও চাহিদা

এ কথা অনস্বীকার্য যে, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন এবং বাংলাদেশ পুনর্বার স্বীকার করে যে এমন অনেক কার্যক্রমই আছে যা একইসঙ্গে অভিযোজন ও প্রশমনে ভূমিকা পালন করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, জাতীয় বনায়ন কর্মসূচির মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরে জেগে ওঠা নতুন চর ও দ্বীপে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বনায়ন এবং বৃক্ষশূন্য পাহাড়ে পুনর্বনায়ন করা হয়েছে। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী এসব চর ও দ্বীপে প্রায় ১ লাখ ৯৫ হাজার বাদাগাছ বেড়ে উঠেছে এবং এই নতুন বনগুলো কার্বন শোষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। লুলুসিএফ খাতে ভবিষ্যত গ্রীনহাউজ গ্যাস নির্গমন ও প্রশমনের উপায়সমূহ সম্পর্কে আরো বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন এবং এ ধরনের বিশ্লেষণ সম্পন্ন হবার পর অভিযোজন-প্রশমন সংশ্লেষণের জন্য বনায়ন খাতটিকে পুনরায় বিবেচনায় নিতে হবে।

বলাবাহুল্য, ১৬ কোটি মানুষের বিপন্নতা মোকাবেলা করার জন্য যে পরিমাণ সম্পদ দরকার, বাংলাদেশের নিজস্ব সম্পদে গৃহীত আভ্যন্তরীণ বা জাতীয় জলবায়ু অভিযোজনের সম্মিলিত উদ্যোগ তার থেকে অনেক দূরে। এ কারণেই, বাংলাদেশের জলবায়ু-সহিষ্ণু উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনার আওতায় সম্পদ প্রয়োজন। জলবায়ু অভিযোজনের জন্য সমন্বিত কর্মসূচি গ্রহণে এ সম্পদ সহায়তা করবে এবং জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা (ন্যাপ) এই কর্মসূচিসমূহের মূল চালিকাশক্তি হিশেবে কাজ করবে।

বাংলাদেশ স্বীকার করে যে, জনসাধারণের সার্বিক সহিষ্ণুতা বৃদ্ধির জন্য সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। এজন্য অভিযোজন নীতিমালা ও কর্মসূচিসমূহের নিরীক্ষণ ও মূল্যায়নের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অভিযোজনমূলক উদ্যোগুলোকে ইতোমধ্যেই জাতীয় নিরীক্ষণ, প্রতিবেদন ও প্রত্যয়ন (এমআরভি) ব্যবস্থার মূলধারায় নিয়ে আসার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

চার. আইএনডিসি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন

সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন, প্রযুক্তি ও কৌশলগত অধিদপ্তর, পেশাজীবী, বিশেষজ্ঞ ও ব্যক্তিখাতের প্রতিনিধিসহ বড়ো আকারের অংশীভাগি এবং বাংলাদেশ সরকারের উপদেষ্টা ও কৌশলগত কমিটিসমূহের সঙ্গে পরামর্শের ভিত্তিতে এই আইএনডিসি প্রণয়ন করা হয়েছে।

যৌক্তিক কারণেই হালনাগাদকৃত বিসিসিএসএপি ও অন্যান্য প্রধান প্রধান নীতিমালা ও পরিকল্পনার অর্থপূর্ণ বাস্তবায়নের কর্মকাঠামোর আওতায় এই আইএনডিসি বাস্তবায়িত হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় বাংলাদেশের সক্ষমতা ও সহিষ্ণুতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিসিসিএসএপিতে ২০০৯-২০১৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য কর্মসূচি নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০১৬ সালে আইএনডিসি বাস্তবায়নের পথনকশা প্রণয়ন করা হবে। তখন বিসিসিএসএপি বাস্তবায়নের বর্তমান অগ্রগতি পর্যালোচনা, ঘাটতি ও প্রয়োজনীয় সহায়তা নিরূপণ এবং আইএনডিসি'তে প্রদত্ত বর্তমান প্রস্তাবসমূহ বাস্তবায়নে বাধাসমূহ পর্যালোচনা করা হবে।

জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অনুমিত অবদান (আইএনডিসি) বাস্তবায়নের পথনকশায় যেসব সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে তা হলো :

- বাস্তবায়নের সম্ভাব্য প্রভাবকের সুপারিশসহ (যেমন : প্রণোদনা, মান নিশ্চিতকরণ, আর্থিক সহায়তা ইত্যাদি) বিস্তারিত অধ্যয়ন ও উন্নয়নের পর জাতীয় ক্ষেত্রে যথাযথ প্রশমন কর্মসূচি (নামা)'তে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে এমন সম্ভাবনাময় প্রশমন উদ্যোগসমূহের তালিকা প্রণয়ন।
- জলবায়ু অর্থায়নের প্রস্তুতি ও ঘাটতির মূল্যায়নসহ বাংলাদেশে জলবায়ু তহবিলের বিদ্যমান দৃশ্যকল্প, প্রয়োজনীয় সহায়তা ও আন্তর্জাতিক তহবিলের দৃশ্যকল্পের পর্যালোচনা। বাংলাদেশের জন্য যথাযথ জলবায়ু অর্থায়ন কৌশলের সুপারিশ তৈরি করা।
- বিদ্যমান উপাত্ত সরবরাহ ও প্রতিবেদন প্রণয়নের কাঠামো ও প্রক্রিয়ার ঘাটতি বিশ্লেষণপূর্বক জাতীয় নিরীক্ষণ, প্রতিবেদন ও প্রত্যয়ন (এমআরভি)'র যথাযথ প্রকরণ ও কাঠামোর প্রাথমিক সুপারিশ তৈরি করা।
- পথনকশা বাস্তবায়নাধীন সময়ে প্রশমন ও অভিযোজন কর্মসূচি এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য মানানসই বরাদ্দের প্রস্তাবনা তৈরি ও বিতরণ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে জাতীয় পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে 'জলবায়ু অর্থব্যবস্থার কাঠামো (সিএফএফ)'-এর সমন্বয় সাধন করা।
- গ্রীন ক্লাইমেট ফান্ড (জিসিএফ)-সহ আন্তর্জাতিক জলবায়ু অর্থায়ন-সুবিধা কার্যকরভাবে নিশ্চিত করার জন্য বিদ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর ঘাটতি বিশ্লেষণ করা এবং শক্তিশালীকরণের জন্য সুপারিশ করা।
- এই আইএনডিসি বাস্তবায়ন ও সমন্বয় সাধনের জন্য যথাযথ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর সুপারিশ করা।

- এই 'জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অনুমিত অবদান (আইএনডিসি)'র মূল উপাদানসমূহ স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি কার্যাবলীতে বিভক্ত করে বাস্তবায়নের স্পষ্ট পথনকশা ও সময়সীমা নির্ধারণ করা।

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক সচিবালয়ের বিদ্যমান সমন্বয়-ব্যবস্থার আওতায় এবং উপদেষ্টা কমিটি ও জাতীয় পরিবেশ কমিটি (ঘউঈ, যার সভাপতি প্রধানমন্ত্রী)-এর নিকট দায়বদ্ধ থেকে বিসিসিএসএপিতে উল্লিখিত বিদ্যমান প্রশাসনিক ব্যবস্থাই এই আইএনডিসি'র বাস্তবায়ন কার্যক্রম এগিয়ে নিয়ে যাবে। সরকারের অর্থব্যবস্থা-কাঠামোর আওতায় প্রদত্ত আর্থিক সহায়তায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও দপ্তর সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে। বিদ্যমান জলবায়ু অর্থব্যবস্থার কাঠামো ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে একটি সমন্বিত ও শক্তিশালী আইএনডিসি বাস্তবায়ন কর্মকাঠামো প্রণয়ন করা হবে।

পাঁচ. আইএনডিসি বাস্তবায়নে সহায়তা

বাংলাদেশের জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অনুমিত অবদান (আইএনডিসি) বাস্তবায়নের জন্য অর্থায়ন, প্রযুক্তি হস্তান্তর ও সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ সুনির্দিষ্ট সম্পদ দরকার হবে। এই পরিচ্ছেদে অভিযোজন ও প্রশমনে বাংলাদেশের প্রয়োজনীয় ব্যয়ের ধরন এবং জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক বিদ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হয়েছে।

৫.১ অভিযোজন ব্যয়

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশলপত্র ও কর্মপরিকল্পনা (বিসিসিএসএপি)'তে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সর্বোচ্চ ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর একটি হওয়ায়, বাংলাদেশের প্রয়োজনীয় সম্পদের সিংহভাগই অভিযোজন ও জলবায়ু-সহিষ্ণুতা বৃদ্ধির উপর আলোকপাত করবে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা, আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা, উন্নততর সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা, উপকূলীয় বেড়িবাঁধ ও পোল্ডারগুলোর আধুনিকায়ন, উন্নততর উপায়ে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং বন্যা প্রতিরক্ষা বাঁধ ও নিষ্কাশন পদ্ধতির আধুনিকায়ন বিষয়ে বিনিয়োগের ধরন নির্ধারণ করা হয়েছে[৪]।

বিশ্বব্যাংকের ২০১০ সালের প্রাক্কলন অনুযায়ী[৫] ২০৫০ সাল নাগাদ গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের সঙ্গে অভিযোজন খাতে ব্যয় হবে ৫৫১ কোটি ৬০ লক্ষ মার্কিন ডলার এবং বার্ষিক ব্যয় দাঁড়াবে ১১ কোটি ২০ লক্ষ মার্কিন ডলার। এছাড়া ২০৫০ সাল নাগাদ আভ্যন্তরীণ মৌসুমি বন্যার সঙ্গে অভিযোজনে ব্যয় হবে ২৬৭ কোটি ১০ লক্ষ মার্কিন ডলার এবং বার্ষিক ব্যয় দাঁড়াবে ৫ কোটি ৪০ লক্ষ মার্কিন ডলার। মাত্র এই দুটি খাত বিবেচনায় নিলে ২০৩০ সাল নাগাদ অভিযোজন ব্যয় দাঁড়াবে ৬৫৯ কোটি মার্কিন ডলার।

দেশের জরুরি ও তাৎক্ষণিক চাহিদা বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে কিছু প্রধান প্রধান অভিযোজনমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। দেশের জলবায়ু-সহিষ্ণুতা বাড়ানোয় নির্দিষ্ট অভিযোজন উদ্যোগসমূহ বাস্তবায়নের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলার উদ্দেশ্যে চিহ্নিত অভিযোজন উদ্যোগসমূহ বাস্তবায়নের জন্য ২০১৫ সাল থেকে ২০৩০ সাল পর্যন্ত মেয়াদে ৪ হাজার কোটি মার্কিন ডলার প্রয়োজন হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে (বিস্তারিত দেখার জন্য পরিচ্ছেদ-৩ দেখুন)। এই ছকে জাতীয় অভিযোজন কর্মপরিকল্পনা (নাপা) ও বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশলপত্র ও কর্মপরিকল্পনা (বিসিসিএসএপি)'র পাশাপাশি জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা (ন্যাপ)-এর পথনকশা ও ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে কর্মসূচি যুক্ত করা হয়েছে। অপর পৃষ্ঠায় কয়েকটি সুনির্দিষ্ট অভিযোজন সম্পর্কিত ব্যয়ের উদাহরণ দেয়া হলো :

---

4. See box 7 of the Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan (BCCSAP).

5. World Bank. 2010. Main report. Washington, DC: World Bank. http://documents.worldbank .org/cura-ed/en/2010/01/16420806/bangladesheconomic-adapta- tion-climate-change-vol-1-2- main-report

ছক ৭	প্রধান প্রধান অভিযোজন কর্মসূচির প্রাক্কলিত ব্যয়
অভিযোজন কর্মসূচি	**প্রয়োজনীয় আনুমানিক বিনিয়োগ (মার্কিন ডলারে, ২০১৫-২০৩০)**
খাদ্য নিরাপত্তা, জীবিকা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা (পানি নিরাপত্তাসহ)	৮০০ কোটি
সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	১,০০০ কোটি
লবণ অনুপ্রবেশ রোধ ও উপকূলীয় প্রতিরক্ষা	৩০০ কোটি
নদীজাত বন্যা ও ভাঙন প্রতিরোধ	৬০০ কোটি
জলবায়ু-সহিষ্ণু অবকাঠামো নির্মাণ	৫০০ কোটি
পল্লী বিদ্যুতায়ন	৩০০ কোটি
জলবায়ু-সহিষ্ণু নগরায়ন	৩০০ কোটি
প্রতিবেশভিত্তিক অভিযোজন (সহ-ব্যবস্থাপনাধীন বনায়নসহ)	২৫০ কোটি
জলাভূমি ও উপকূলীয় এলাকার সমাজভিত্তিক সংরক্ষণ	১০০ কোটি
জাতীয় নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বাড়ানো	৫০ কোটি

৫.২ প্রশমন ব্যয়

প্রশমন কার্যক্রমের জন্য বিনিয়োগের সুযোগ, আওতা ও মাত্রা যাচাইয়ে আরো কাজ করা দরকার (আইএনডিসি বাস্তবায়ন বিষয়ে পরিচ্ছেদ-৪ দেখুন)। তবে, প্রধান প্রধান প্রশমন উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্য ২০১১-২০৩০ সাল মেয়াদে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের ধরন সম্পর্কে কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে দেয়া হলো :

ছক ৮	প্রধান প্রধান প্রশমন কর্মসূচির প্রাক্কলিত ব্যয়
প্রশমন কর্মসূচি	**প্রয়োজনীয় আনুমানিক বিনিয়োগ (মার্কিন ডলারে, ২০১১-২০৩০)**
১০০ শতাংশ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র সুপার ক্রিটিক্যাল বয়লারে রূপান্তর	১,৬৫০ কোটি
জাতীয় পর্যায়ে সরবরাহ করা যায় এমন পরিমাণ সৌর-বিদ্যুৎ উৎপাদন	১৩০ কোটি

প্রশমন কর্মসূচি		প্রয়োজনীয় আনুমানিক বিনিয়োগ (মার্কিন ডলারে, ২০১১-২০৩০)
বায়ুবিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়ানো		৬০ কোটি
জলবিদ্যুৎকেন্দ্রের টারবাইনগুলো শক্তিশালী করার জন্য সমন্বিত আবর্তনের গ্যাস টারবাইনে রূপান্তর		৬৩ কোটি
'সৌরশক্তিভিত্তিক বাড়ি' কর্মসূচি সম্প্রসারণ		১২০ কোটি
অন্যান্য সৌরশক্তি-সংশ্লিষ্ট উদ্যোগ	সৌরচালিত সেচপাম্প প্রচলন	৬০ কোটি
	সৌরবিদ্যুতের ক্ষুদ্র সরবরাহ-জাল তৈরি	২৫ কোটি
	সৌরবিদ্যুতের অতিক্ষুদ্র-সরবরাহ পদ্ধতি প্রচলন	২৭ কোটি
	পিকো-সোলার প্রবর্তন	১০ কোটি
আখ থেকে জৈবজ্বালানি তৈরির উদ্যোগ সম্প্রসারণ		২০ কোটি
ঢাকা মহানগরীর প্রধান সড়কগুলোর যানজট দূর করার জন্য একটি এলিভেটেড এক্সপ্রেস হাইওয়ে নির্মাণ		২৬৫ কোটি
ঢাকায় দ্রুততর গণ-পরিবহণ পরিচালনা পদ্ধতি গড়ে তোলা		২৭০ কোটি

আশা করা হচ্ছে যে, অর্থায়নের মাধ্যমগুলোর মধ্যে অধিকতর কার্যকর সংশ্লেষণের ফলে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল এমনভাবে বৃদ্ধি করবে যা বিনিয়োগের অংশগুলোর সমষ্টির তুলনায় বৃহত্তর হবে। টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করা এবং ২০২১ সালের মধ্যে মধ্য-আয়ের দেশে পরিণত হবার লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে এই দলিল বাস্তবায়নের জন্য আন্তর্জাতিক জলবায়ু অর্থায়ন থেকে সুবিধা পাওয়া বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পরিশিষ্ট ১. অভিযোজন প্রকল্প এবং অর্জনসমূহ

এলজিইডি (স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর)

- জলবায়ু অভিযোজন ও জীবিকা সুরক্ষাসহ (HILIP) হাওর অবকাঠামো ও জীবিকা উন্নয়ন প্রকল্প (CALIP)। লিংক : http://www.lged.gov.bd/ProjectHome.aspx?projectID=274
- ঘূর্ণিঝড় ২০০৭-পরবর্তী জরুরি পুনরুদ্ধার ও পুনর্নির্মাণ প্রকল্প (ECRRP) : এলজিইডি অংশ। লিংক : http://www.lged.gov.bd/ProjectHome.aspx?projectID=33

পাউবো (পানি উন্নয়ন বোর্ড)

লিংক
http://www.bwdb.gov.bd/index.php?option=com_content&view=article&id=133&Itemid=120

বিআইডাব্লিউটিএ (বাংলাদেশ আভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ কর্তৃপক্ষ)

লিংক
http://www.biwta.gov.bd/website/?page_id=9

সড়ক ও জনপথ (মহাসড়ক বিভাগ), সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রণালয়

- এ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট প্রকল্পসমূহ তিনভাগে বিভক্ত :
- বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পসমূহ : http://www.rthd.gov.bd/foreign_project.php
- বৃহৎ প্রকল্পসমূহ : http://www.rthd.gov.bd/elibrary.php
- জরুরি ভিত্তিতে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ : http://www.rthd.gov.bd/fast_track_project.php

বিসিসিটিএফ (বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড)

লিংক
http://www.bcct.gov.bd/images/180814/Updated%20Project%20List%2017.11.pdf

নির্ঘণ্ট

বাংলা ও ইংরেজি পরিভাষা

অংশীভাগি	Stakeholder	পৃ. ১৮
অতিক্ষুদ্র বিদ্যুৎ সরবরাহ-জাল	Nano Grid	পৃ. ৬, ২২
অনিয়মিত	Erratic	পৃ. ১
অবকাঠামো	Infrastructure	পৃ. ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ২১
অবদান, ভূমিকা	Contribution	পৃ. ১, ২, ৩, ৪, ৬, ৮, ১০, ১১, ১২, ১৭, ১৮, ২০
অভিঘাত, প্রভাব	Impact	পৃ. ১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৮, ২০
অনুমান, অভিপ্রায়, সংকল্প	Intend	পৃ. ১, ২, ৩, ১০, ১৮, ২০
অভিযোজন, খাপ খাওয়ানো	Adaptation	পৃ. ২, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ২০, ২১, ২৩
অম্লায়ন	Acidification	পৃ. ১
অর্থায়ন	Financing	পৃ. ২, ৭, ১২, ১৬, ১৮, ২০, ২২
আর্থসামাজিক	Socioeconomic	পৃ. ১
আবর্তন	Cycle	পৃ. ৬, ৯, ২২
উষ্ণীকরণ	Heat Insulation	পৃ. ৬
কমানো, হ্রাস করা	Reduction	পৃ. ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ১১, ১২, ১৩, ১৬
কর্মকাঠামো	Framework	পৃ. ৫, ১৩, ১৪, ১৮, ১৯, ২০
কার্বন পদচিহ্ন	Carbon Footprint	পৃ. ১২
কার্বন-দক্ষ, কার্বন-সাশ্রয়ী	Carbon Efficient	পৃ. ১, ৫
খরা	Drought	পৃ. ১, ১৩, ১৫
গতানুগতিক কার্যক্রম	Business As Usual	পৃ. ২, ৩, ৪, ৭, ৮, ৯
গ্রীষ্মমণ্ডলীয়	Tropical	পৃ. ১, ১৩, ১৫, ২০
ঘাতসহিষ্ণু	Stress Tolerant	পৃ. ১৫, ১৬
ঘূর্ণিঝড়	Cyclone	পৃ. ১, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ২০, ২৩
চর	Islet	পৃ. ৯, ১৭
চিত্রকল্প	Scenario	পৃ. ৪
চুক্তি, সমঝোতা	Agreement	পৃ. ১
জলোচ্ছ্বাস	Storm Surge	পৃ. ১৩, ১৫, ২০

জ্বালানি	Energy	পৃ. ২, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ১০, ১১, ২২
জৈবজ্বালানি	Biomass	পৃ. ৮, ২২
জোয়ারোচ্ছ্বাস	Tidal Surge	পৃ. ১
তাপমাত্রা	Temperature	পৃ. ১, ১২
নকশা	Model	পৃ. ৩
নির্গমন	Emission	পৃ. ১, ২, ৩, ৪, ১০, ১১, ১২, ১৭
নির্বনায়ন, বৃক্ষশূন্য করা	Denudation	পৃ. ১৭
পথনকশা	Roadmap	পৃ. ৬, ১৬, ১৮, ১৯, ২০
পদচিহ্ন	Footprint	পৃ. ১২
প্রবৃদ্ধি	Growth	পৃ. ১, ৫, ১৩, ২২
প্রশমন	Mitigation	পৃ. ১, ২, ৩, ৫, ৬, ৭, ৮, ১১, ১২, ১৭, ১৮, ২০, ২১, ২২
বাদা	Mangrove	পৃ. ৯, ১৭
বাধাগ্রস্ত	Jeopardise	পৃ. ১
বিদ্যুৎ	Power	পৃ. ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১৬, ২১, ২২
বিপন্ন	Vulnerable	পৃ. ১, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭
বিপন্নতা	Vulnerability	পৃ. ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭
বৃষ্টিপাত	Rainfall	পৃ. ১, ১৩
ভাঙন	Erosion	পৃ. ১৩, ১৪, ২১
মূলধারা	Mainstream	পৃ. ১৩, ১৭
শীতলীকরণ	Cooling	পৃ. ৬
শোষণ (কার্বন)	Sequestration	পৃ. ১৭
সনদ	Convention	পৃ. ৫
সমুদ্রপৃষ্ঠ	Sea Level	পৃ. ১
সহ-সুফল	Co-benefit	পৃ. ১১, ১২
সহিষ্ণু	Resilient	পৃ. ১, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ২০, ২১
সহিষ্ণুতা	Resilience	পৃ. ১, ১৩, ১৪, ১৫, ১৭, ১৮, ২০,
সৌরশক্তিভিত্তিক বাড়ি	Solar Home	পৃ. ৬, ২২
ক্ষতিগ্রস্ত করা	Affect	পৃ. ১, ১৩, ২০

ক্রিশ্চিয়ান কমিশন ফর ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ (সিসিডিবি)
উপকূলীয় জীবনযাত্রা ও পরিবেশ কর্মজোট (ক্লিন)
গ্রামীণ জীবনযাত্রার স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের জন্য প্রচারাভিযান (সিএসআরএল)
অ্যাক্টনাও ক্যাম্পেইন, অ্যাক্ট অ্যালায়েন্স ও
ব্রেড ফর দ্য ওয়ার্ল্ড-এর যৌথ উদ্যোগে
এই ভাষান্তরিত পুস্তিকাটি প্রকাশিত

http://www.ccdb-bd.org http://www.cleanbd.org